

ভগবৎ-দর্শন

৪৬ তম বর্ষ ■ ২য় সংখ্যা ■ বিষ্ণু ৫৩৬ ■ এপ্রিল ২০২২

বিষয়-সূচী

শিখক	মানুষ কুকুর ও শূকরের মতো জীবনযাপন করছে জগতে মনুষ্য প্রজন্মের মূল্য কষ্টভোগের তিনি প্রধান কারণ এবং তার প্রতিকার শ্রীমন্তগবদ্ধীতার প্রাথমিক আলোচনায় অর্জনের ত্রয়োদশতম প্রশ্ন সখা বৎসল ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ব্রহ্মসংহিতা গৃহস্থ জীবনে কেমনভাবে থাকা উচিত	৩ ৬ ১০ ১৪ ১৭ ২০ ২৫
	প্রশ্ন উত্তর	৯
	অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রসাদ	১৩
	ইসকন সমাচার	২১
	ছোটদের আসর	৩০
	ভঙ্গি কবিতা	৩২



আমাদের উদ্দেশ্য

- সকল মানুষকে মোহ থেকে বাস্তবতা, জড় থেকে চিন্ময়তা, অনিত্য থেকে নিত্যতার পার্থক্য নির্ণয়ে সহায়তা করা।
- জড়বাদের দৈষণ্ডলি উন্মুক্ত করা।
- বৈদিক পদ্ধতিতে পারমার্থিক জীবনের পথ নির্দেশ করা।
- বৈদিক সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রচার।
- শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করা।
- সকল জীবকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ করানো ও তাঁর সেবা করতে সাহায্য করা।

মস্পাদকীয়

ভগবৎ-দর্শন

হরেকৃষ্ণ আনন্দলনের পত্রিকা



প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণপাত্রীমুর্তি

শ্রীল অভ্যরণরবিদ্ব ভক্তিবেদান্ত স্বামী পত্রুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামূল সংখ্যের প্রতিষ্ঠাতা।

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের ট্রাস্টি শ্রীমৎ
জ্যোতিতাকা স্বামী মহারাজ • সম্পাদক
শ্রীপাদ সনাতনগোপাল দাস • সহ-সম্পাদক
অরবিন্দ গোপাল দাস • সম্পাদকীয়
পরামর্শক পুরুষোত্তম নিতাই দাস
• অনুবাদক স্বরাট মুকুন্দ দাস ও শরণাগতি
মাধবীদেবী দাসী • প্রফুল্ষ সংশোধক
সনাতনগোপাল দাস • ডিটিপি তাপস বেরা
• প্রচন্দ জহর দাস • হিসাব রক্ষক গোবিন্দ
ধানুক • প্রাহক সহায়ক পার্থপ্রাণ দাস ও চন্দ্ৰ
মাধব দাস • সৃজনশীলন শুভজিৎ মোদক
• প্রকাশক ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের পক্ষে
সত্যদর্শী নন্দা দ্বারা প্রকাশিত

অফিস অজস্র অ্যাপার্টমেন্ট, ১০ গুরুসদয়
রোড, ফ্ল্যাট ১-বি, কলকাতা ৭০০০১৯,
মোবাইল ৯০৭৩৭৯১২৩৭

মেইলঃ btgbengali@gmail.com

বাংলারিক গ্রাহক ভিক্ষা

ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার (রেজিস্টারড ডাকঘোগে) ১ বছরের জন্য - ৬০০ টাকা, ২ বছরের জন্য - ১২০০ টাকা • ভগবৎ-দর্শন (রেজিস্টারড ডাকঘোগে) ১ বছরের জন্য - ৫০০টাকা, ২ বছরের জন্য - ১০০০ টাকা • মানি অর্ডার উপরিউক্ত ঠিকানায় ডাকঘোগে পাঠান অথবা নিম্নলিখিত ব্যাক্ষ অ্যাকাউন্টে আপনার গ্রাহক ভিক্ষার টাকা জমা করুন।

অ্যাঞ্জিস ব্যাক্ষ (কোলকাতা প্রধান শাখা)

৭, শেঙ্গপিয়ার সরণী, কোলকাতা
ব্যাক্ষ অ্যাকাউন্ট নম্বর - ০০৫০১০১০০৩২৯৪৩৯
আই.এফ.এস.সি - UTIB 0000005
ব্যাক্ষ অ্যাকাউন্ট নাম - ইসকন

আপনার ঠিকানা পরিবর্তন অথবা গ্রাহক ভিক্ষা
সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে উপরিউক্ত
ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

আপনার প্রশ্নের শীৰ্ষ উত্তর পেতে হলে আপনার
সাম্প্রতিক গ্রাহক ভিক্ষার রসিদ এবং তার বিবরণটি
আমাদের কাছে পাঠায়ে দিন। আট সপ্তাহের মধ্যে
আপনাকে সহায়তা দেওয়া হবে।



ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট

বৃহৎ মৃদুপ্রস্ত ভবন, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,
পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪১৩১৩

২০২২ ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট দ্বারা সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত।



ভগবান রামই শুধুমাত্র আমাদের অন্তর্নিহিত রাবণকে বিনষ্ট করতে পারেন

রাক্ষসরাজ রাবণের নৃশংসতা থেকে জগতকে রক্ষা করার নিমিত্ত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে ব্যক্তিগতভাবে জগতে আবির্ভূত হবার প্রয়োজন ছিল না। পরমেশ্বর ভগবান নিজ ইচ্ছায় এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি এবং ধ্বংস করেন। সেইজন্য তিনি রাবণকে নিধন করার ইচ্ছা দ্বারাই রাবণকে নিধন করতে পারতেন। কিন্তু তিনি দেখতে চেয়েছিলেন যে যারা তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করেন, এই জগতে তারা কখনও ক্লেশ ভোগ করে না এবং তিনি সর্বদা প্রত্যেককে আশ্রয় দান করতে প্রস্তুত। রামায়ণে আমরা দেখি যে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র রাবণের সকল দুঃখের ক্ষমা করতে ইচ্ছুক ছিলেন। সুতরাং তিনি রাক্ষসকে নিজের ভুল সংশোধন করে তাঁর নিকট ফিরে আসার জন্য করেকটি সুযোগ দিয়েছিলেন।

রামভক্ত বিভীষণ তার ভাতাকে বোঝাবার সর্বোত্তম প্রচেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু অহঙ্কারী রাবণ বিভীষণকে তিরক্ষার করে তার রাজ্য থেকে বহিস্থার করে দেন। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সর্বাপেক্ষা সুপ্রসিদ্ধ ভক্ত হনুমান ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের শাস্তিদূরণপে গিয়েছিলেন। কিন্তু সুচেতনা রহিত রাবণ তার লেজে আগুন ধরিয়ে তাকে অত্যাচার ও অপমান করার চেষ্টা করেন। রাবণের মূর্খ অনুগামীরা তার লেজে আগুন লাগিয়ে ছিল, সেই লেজের আগুনে হনুমান লক্ষার সোনার নগরীকে সম্পূর্ণভাবে দম্ভ করে নিজের বীরত্ব প্রদর্শন করেন। যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে হনুমান ধর্মের নীতি পালন করে সীতামাতাকে ফিরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করতে রাবণের কাছে গিয়েছিলেন। কিন্তু অহঙ্কার, দম্ভ ও গর্বে পরিপূর্ণ দশানন রাবণ ভেবেছিলেন যে তিনি সীতামাতার পতি পরমেশ্বর ভগবান রামকে হত্যা করে সীতামাতাকে ভোগ করতে পারবেন। রাবণের এই জেদ শুধুমাত্র তার মৃত্যুই নয়, তাঁর পুত্র, ভাতা, মন্ত্রীগণ এবং অগণিত সেনার মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। নারীগণ বিধৰা হয়েছিল, শিশুরা অনাথ হয়েছিল এবং বয়স্ক পিতামাতাগণকে তাদের পুত্রের মৃত্যু এবং তাদের পুত্রবধূ ও পৌত্রাদির ক্লেশের উদ্বেগ ও যাতনা ভোগ করতে হয়েছিল। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে লালসা, ক্ষেত্র ও লোভ হলো নরকের দ্বার। রাবণ লালসার প্রতিমূর্তি। রাবণের জীবন থেকে আমরা উপলক্ষি করতে পারি লালসা কত বিপজ্জনক এবং কিভাবে সেটি একজনের জীবনকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র করেক শতাব্দী পূর্বে রাবণকে নিধন করেছিলেন। কিন্তু লালসার রাক্ষস আজও আমাদের হাদয়ে অবস্থান করে আমাদের পাপকর্মে প্রবৃত্ত করে এবং আমাদের জীবনে দুর্ভাগ্য নিয়ে আসে। লালসা আমাদের বৃহত্তম শক্তি। সকল প্রকার লালসাপূর্ণ চিন্তা থেকে মুক্ত হবার জন্য আমাদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা করা উচিত। যেমন ভগবান শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে সংশোধনের অনেক সুযোগ প্রদান করেছেন, অনুরূপভাবে করুণাময় ভগবান আমাদের অভ্যন্তরের রাবণকে ধ্বংস করার জন্য আমাদের অনেক সুযোগ প্রদান করেন। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করে নিরন্তর ভক্তিমূলক সেবায় নিয়োজিত থাকলে আমাদের হাদয় সকল লালসাপূর্ণ অভিলাষ থেকে মুক্ত হবে।

শ্রীযমুনাচার্য, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের (যিনি ভগবান রাম) এক মহান ভক্ত বলেছেন, “যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময় চিন্ময় সেবায় নিয়োজিত থেকে আমি তাঁর মধ্যে নিত্য আনন্দ উপলক্ষি করি, যখনই আমি যৌন সুখের কথা ভাবি আমার ওষ্ঠ ঘৃণায় কৃত্তিত হয় এবং আমি সেই চিন্তার প্রতি থুকার করি।”

সেইজন্য আমাদের আপন মঙ্গলের জন্য বিভীষণের মতো দৃঢ় সাহসিকতায় রাবণের আশ্রয় পরিত্যাগ করে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। কারণ একমাত্র ভগবান শ্রীরামচন্দ্রই আমাদের অভ্যন্তরস্থিত রাবণকে ধ্বংস করতে সক্ষম। প্রেমময় ভগবান আনন্দের সঙ্গে আমাদের গ্রহণ করবেন যেমন তিনি বিভীষণকে গ্রহণ করেছিলেন এবং আমাদের জীবন মহিমাপ্রিত হয়ে উঠবে।



শীল প্রভুপাদ : বর্তমানে কোনো প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি
নেই। সবাই অশান্ত কুকুর এবং শুকর। প্রকৃতপক্ষে অশান্ত
কুকুর-শুকর হওয়াকেই তারা প্রথম কর্ম বলে মনে করছে।
তারা কুকুর ও শুকরের মতো জীবনযাপন করছে কিন্তু
নিজেদের অত্যন্ত সভ্য বলে দাবী করছে।

যদি তুমি বিশ্লেষণাত্মকভাবে লক্ষ্য কর, তুমি আধুনিক
মানুষের জীবন এবং কুকুর ও শুকরের জীবনের মধ্যে
কোনো মৌলিক পার্থক্য দেখবে না। কুকুর ও শুকরেরা
সারাদিন ধরে বিরামহীনভাবে কর্ম করতেই থাকে। কষ্টান্ত
কামান অর্হতে। পশুদের ইন্দ্রিয়ের খেয়াল এবং তাদের
কর্মের কোনো অন্ত নেই। লঙ্ঘনে, নিউইয়র্কে ভোরবেলা
থেকে মানুষ গাড়ি চালিয়ে কর্মস্তলে যাচ্ছে।

পাট-পাট-পাট-পাট।

তারা এমনকি রাতেও শাস্তিপূর্ণ ভাবে বিশ্রাম নেয় না।
উৎকর্ষ হল “যদি আমি তাড়াতাড়ি কারখানায় না পৌঁছাই,
আমার বেতন বিপন্ন হবে—সন্ত্বতঃ আমার সম্পূর্ণ আয়
বিপদগ্রস্ত হবে”। তারা সর্বদা উদ্বিগ্ন। সদা-সমুদ্রিঙ্গ-ধীয়মঃ
বর্তমানে মানুষ সর্বদাই উদ্বিগ্ন।

কেন এত উদ্বেগ? অসদ্ব-গ্রহণ তারা এমনকিছু শক্ত
করে আঁকড়ে ধরে আছে যা অনিত্য—যেমন জড়দেহ। এই
দেহের প্রতি অত্যধিক আসঙ্গিক আমাদের সমস্ত উদ্বেগের
কারণ।

সুতরাং ভাবন, শুকর সমাজে ও মানব সমাজের মধ্যে
পার্থক্য কী? সুন্দর পোষাক? তাহলে তুমি যদি এক সুন্দর



শুকরকে সুন্দর পোষাকে সজ্জিত করো, সে মানুষ হয়ে যাবে? দুর্ভাগ্যজনকভাবে মানুষ বর্তমানে বহিরঙ্গের পোষাক, বাহ্যিকভাবে মনুষ্য হওয়ার প্রদর্শনী করছে কিন্তু প্রকৃত সভ্যতা, প্রকৃত জীবন কী তারা জানে না। তারা কিছুই জানে না। যখন তুমি তাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রদান করতে যাবে, তারা বলবে “ওহ, দারিদ্র্যক্লিষ্ট ভারতবর্ষ থেকে আমাদের জ্ঞান নিতে হবে?” তারা জানে না যে এই আধ্যাত্মিক জ্ঞান সেই পাশ্চাত্যের অনুকরণকারী, শিল্পবিহীন ভারত থেকে আসেনি। বরঞ্চ এটি এসেছে কৃষ্ণভাবনাময়, জ্ঞানী, কৃতী এবং গ্রামীণ সমৃদ্ধশালী ভারতবর্ষ থেকে।

যারা এই আধ্যাত্মিক জ্ঞান ত্যাগ করেছে তারা দরিদ্র। আমরা যারা এই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অনুশীলন করছি আমরা দারিদ্রক্লিষ্ট নই।

প্রাত্যহিক বিষয়ের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও এই জ্ঞান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানুষকে উপলব্ধি করতে দাও, “আমি এই দেশ নই—আমি নাইজেরিয়ান নই, আমি আমেরিকান নই, আলবেনিয়ান নই, ইরানি নই, না অন্যকিছু। আমি শুন্দি আত্মা, পরমাত্মার অংশ বিশেষ।”

এখন তুমি অবশ্যে তোমার প্রকৃত জাতিসংঘ পাবে।

অন্যথায় তোমার কি আছে? এই অশান্ত মূর্খেরা দেহাত্মবোধে রয়েছে---“আমি ভারতীয়”, “আমি আইরিশ”, “আমি লেবানিজ” — গত তিরিশ বছর ধরে শুধু ঘেউ ঘেউ করছে। একতার প্রকৃত ভিত্তির প্রতি, তাদের আধ্যাত্মিক পরিচয়ের প্রতি অঙ্গ থেকে নিজেদের সংঘবন্ধ বলছে। সরল, শান্তিপূর্ণ, জীবনের

প্রতি অঙ্গ। শুধুমাত্র তাদের বিভিন্ন দেহগত ভাস্তু ধারণার বিষয়ে চিংকার করছে।

শিষ্য : শ্রীল প্রভুপাদ, আপনি বিভিন্ন সময়ে জাতিসংঘের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের বলেছেন যে, তাদেরটি শুধুমাত্র চিংকাররত কুকুরের একটি সংঘ, এবং তারা সবসময়েই এমন একটি বলিষ্ঠ মন্তব্যে আশ্঵স্ত হয়েছে।

শ্রীল প্রভুপাদ : হ্যাঁ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটিই ঘটনা। আজ মানুষ কিছু চিংকাররত কুকুরের থেকে প্রথক নয়। “আমি একটি বুলডগ”, “আমি টেরিয়ার”, “আমি কলি”, “আমি গ্রীকা”, “আমি ফরাসী”, “আমি সুইড”। নিজেদের পরিচয় সম্বন্ধে এই ভাস্তু ধারণায় তারা এত শক্তি, অর্থ, সময় নষ্ট করে দেহগত উৎকর্ষ বিষয়ে শুধুমাত্র চিংকার করছে।

এই চিংকারের কোনো ফল নেই। কোনো জাতি সংঘ নেই। বরঞ্চ প্রতিদিনই কিছু নতুন জাতীয় পতাকার আত্মপ্রকাশ ঘটে। ভরম্ উদ্বহতো বিমুচ্যানঃ তারা একতার জন্য বিশাল শব্দাভ্যর্থপূর্ণ আয়োজন করেছে। ফল শূন্য।

এবং তাদের সুস্পষ্ট অকৃতকার্যতা সম্মেলনে তারা মুখ্য থাকা স্থির করেছে। “ওহ, জাতিসংঘ। একতার লক্ষ্যে আমরা এক জমকালো প্রচেষ্টা করছি। অবশ্যই আমাদের কোন একতা নেই, কিন্তু আমাদের ভবন তিনশ হাজার পতাকা দিয়ে সুসজ্জিত।”

সমস্যা হল, তারা পতাকাকে প্রণাম জানাচ্ছে, ভগবানকে নয়। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, মাঁ নমস্কুরঃঃ “তোমরা সবাই আধ্যাত্মিক জীব, সুতরাং আমাকে প্রণতি নিবেদন করে



আনন্দিত হও।” কিন্তু তারা ভাবছে, “না, পতাকাকে প্রণাম করি। আমাদের অবশ্যই একটি পতাকাকে প্রণতি নিবেদন করা উচিত।” দেখুন তারা কতো মূর্খ! কিছু পতাকাকে প্রণাম জানিয়ে তারা কিলাভ করবে?

শিয়ৎ : পরের জন্মে, ভগবৎধামে ফিরে যাওয়ার পরিবর্তে তারা একই দেশে হয়ত আরশোলা হয়ে জন্মাবে।

শ্রীল প্রভুপাদ : এবং তখন তাদের দেশের মানুষেরা তাদের মারবে।

“না, বন্ধুগণ দয়া কর আমাকে মেরো না। আমি তোমার দেশের লোক। আমি একই জাতি।”

“কে তোমার মতো মাছি এবং আরশোলার পরোয়া করে? আমরা তোমাকে মারব।

‘আমেরিকান আরশোলা’? কে তোমার পরোয়া করে?”

“না, তুমি বুঝছ না। পূর্বজন্মে আমি একজন দৃঢ়চেতা জাতীয়তাবাদী ছিলাম। হ্যাঁ, জড় জাগতিক বিভাস্তি এবং অত্যধিক আসক্তির ফলে আমি আরশোলার দেহ এখন পেয়েছি। কিন্তু দয়া করে আমায় মেরো না।”

যদি তুমি একটি আরশোলা হও, এমনকি আমেরিকান হলেও কে তোমার পরোয়া করবে? কেউ কি তোমার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেবে? কিন্তু দেহান্তর প্রাপ্তি: এই দেহের পর, তোমাকে অপর একটি দেহ প্রহণ করতে হবে। সেটা তুমি এড়াতে পারবে না। তখন তোমার এই

জাতীয়তাবাদ তোমার কী ভাল করবে? এখন তুমি বড় জাতীয়তাবাদী। কিন্তু যখন তোমাকে অপর একটি দেহ ধারণ করতে হবে, তুমি কিভাবে নিজেকে এক আরশোলা হওয়া থেকে রক্ষা করবে?

দুর্ভাগ্যক্রমে তোমার পরবর্তী দেহ তোমার ইচ্ছানুসারে হবে না। সেটি অপরের হাতে। কর্মেন দৈব-নেত্রেনঃ এই দেহে তোমার কৃতকর্ম অনুসারে। প্রকৃতির ব্যবস্থাপনায় তুমি একটি উপযুক্ত পরবর্তী দেহ লাভ করবে।

কিন্তু সেটি প্রকৃতির তত্ত্বাবধানে। তুমি বলতে পার না “আমাকে একটি অত্যন্ত ধনী আমেরিকান পরিবারে একটি সুন্দর দেহ প্রদান করো।” প্রকৃতি মাতা বলবেন, “না, না। তোমার সেই বিবেচনার ক্ষমতা নেই। তোমার যদি এইটি থাকত; তুমি মানবজীবন লাভ করতে। বর্তমানে তোমাকে আমার বিবেচনা প্রহণ করতে হবে। তুমি যেভাবে জড়গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অতীতে কর্ম করেছ সেই অনুসারে আমি তোমাকে তোমার নতুন দেহ দেব।”

সুতরাং এই আধ্যাত্মিক হল মহত্ম বিজ্ঞান। কিন্তু দুঃখজনকভাবে এই মহান শিক্ষাবিদগণ এবং নেতৃবৃন্দ এটি জানে না। কেউ এটি জানে না। তাদের জীবনশৈলী যে আন্ত, সেটি না বুঝে তারা প্রশংস করে ভগবান, আঘাত এবং পরবর্তী জীবন একটি আন্ত ধারণা কিনা। এই হল তাদের বুদ্ধি। কি মূর্খতা!



জগতে যুদ্ধ প্রজন্মের মূল্য

শ্রীপাদ জননিবাস দাস ব্রহ্মচারী



যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ না করার জন্য বিভিন্ন রকমের কারণ দেখিয়ে অর্জুন যুদ্ধ এড়িয়ে যেতে চাইছেন। অর্জুন বলছেন যদি আমি এখানে যুদ্ধ করি, তাহলে আমার জন্যে সমস্ত বীর পুরুষেরা নিহত হবে। এর ফলে কুলের কুলনারীগণকে রক্ষা করার জন্য আর কেউ থাকবে না, তারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়বে। যখন কুলের ক্ষয় হবে তখন কুল ধর্মেরও বিনাশ হবে। আর কুলের স্ত্রীলোকগণ তখন অধর্ম আচরণ করবে, ব্যভিচারী হয়ে উঠবে এবং সমাজের মধ্যে উৎশৃঙ্খলতা আসবে। এই স্ত্রীলোকগণ যখন অসং চরিত্রা হয়ে উঠবে তখন অবাঞ্ছিত প্রজাতি উৎপন্ন হবে। এই রকমের কারণ দেখিয়ে অর্জুন বলছেন যে, আমার যুদ্ধ না করাটাই শ্রেষ্ঠ হবে। তিনি সেখানে কারণ দেখাচ্ছেন যে, ‘যদি আমি যুদ্ধ করি তাহলে বর্ণসংক্র উৎপন্ন হবে’। তাই দ্বিতীয় অধ্যায়ে চরিত্র নম্বর শ্লোকে কৃষ্ণ সেটি উৎপন্ন করেছেন। এখানে অর্জুনের যুক্তিকে কৃষ্ণ উল্লেখ করে বলছেন। সেখানে ভগবান কৃষ্ণ বলছেন যে আমি যদি কর্ম না করি, তাহলে এইসব লোকসমূহ উৎসন্ন হবে, আমি বর্ণসংক্র সৃষ্টির কারণ হব এবং তার ফলে সমস্ত প্রজারা বিনষ্ট হবে। এখানে অর্জুন যুক্তি দেখাচ্ছেন যে, ‘আমি যদি যুদ্ধ করি তাহলে স্ত্রীলোকেরা ব্যভিচারী হবে আর বর্ণসংক্র উৎপন্ন করবে।’ আবার কৃষ্ণ বলছেন যে, ‘তুমি যদি যুদ্ধ না কর তাহলে সেটি বর্ণসংক্র উৎপন্ন করবে।’ এখানে কৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করার জন্য তার যুক্তির প্রতি কোন কর্ণপাত না করে যুক্তি

দেখাচ্ছেন।

এই শ্লোকের তাৎপর্যে শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন যদি সমাজে যথার্থ শান্তি স্থাপন করতে হয় তাহলে সমাজের মধ্যে ভালো মানুষদের প্রয়োজনীয়তা আছে। আর একটি সুন্দর সমাজ তখনই উৎপন্ন হয় যখন মানুষ বর্ণাশ্রম ধর্ম যথাযথভাবে পালন করে। বর্ণাশ্রম ধর্মে বিভিন্ন সংস্কার আছে, যেমন সন্তান উৎপন্ন করার পূর্বে গর্ভাধান সংস্কার করা হয়, সেটি এই বর্ণাশ্রম ধর্মের মাধ্যমে হয়ে থাকে। শাস্ত্রে বলা হয়েছে এইরকম সংস্কারের মাধ্যমে যখন একটি সন্তানের জন্ম দেওয়া হয় তখন একটি সংজীবাজ্ঞার গর্ভে আধান হয়ে থাকে। আর বলা হচ্ছে যদি যৌন তৃপ্তির বাসনা বা কামভাবকে চরিতার্থ করার জন্যে ইন্দ্রিয় ব্যবহার করা হয় তাহলে সেই সন্তান উৎপাদনটি রজোগুণের দ্বারা পর্যবসিত হয়ে বর্ণসংকর সৃষ্টি করবে।

বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুশীলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে ক্রমশ তমোগুণ থেকে রজোগুণে, রজোগুণ থেকে সত্ত্বগুণে এবং সত্ত্বগুণ থেকে শুন্দি সত্ত্বগুণে উন্নীৰ্ণ করার জন্য। সন্তান-সন্ততির জন্ম দেওয়ার উদ্দেশ্যটি হচ্ছে তাদেরকে ভগবানের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার রাস্তা দেখানো। শ্রীকৃষ্ণের ভগবদগীতা বলার উদ্দেশ্যটি হল লোকেরা এই জ্ঞানের মাধ্যমে ভগবানের কাছে ফিরে যেতে পারবে। সেইজন্য ভগবান এই গীতার জ্ঞানটি প্রদান করলেন। শাস্ত্রে



বলা হচ্ছে, সমাজের মধ্যে যে দায়িত্বপূর্ণ স্থিতি আছে, উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে পিতা, মাতা, শিক্ষক বা গুরু, তাঁরা এই পদে অভিষিক্ত হতে পারেন না যদি তাঁরা তাঁদের অনুগতজনকে এই জন্ম-মৃত্যুময় সংসার থেকে মুক্তির পথ না দেখাতে পারেন। কুকুর-বেড়ালের সমাজেও সন্তান-সন্ততি আছে, কিন্তু তাদের বর্ণাশ্রমের কোন ব্যাপার নেই। কিন্তু মানব-সমাজের স্থিতি পশু-সমাজের স্থিতি থেকে সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন। এই মনুষ্য জীবন খুব দুর্লভ। আর এই জীবনেই একজন বুঝতে পারেন যে, তিনি কে? কৃষ্ণ কে? কৃষ্ণের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক আছে এবং এই উপলক্ষ্মির মাধ্যমে তিনি ভগবানের কাছেও ফিরে যেতে পারেন। সেই জন্য পিতা-মাতাদের এইটি কর্তব্য হওয়া উচিত যার মাধ্যমে তাদের সন্তান-সন্ততিরা এই জীবনেই ভগবানের কাছে ফিরে যেতে পারেন। সেই জন্য শাস্ত্রে বলা হয়েছে, যদি আপনি আপনার সন্তানদেরকে ভগবানের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে অক্ষম হন, তাহলে আপনি পিতা-মাতা হওয়ার অযোগ্য। কৃষ্ণ বলছেন, তহম বীজপদ পিতা—আমিই হচ্ছি সমস্ত জীবের বীজ আধানকারী পিতা। এইরকম একটি ভাবের সৃষ্টি হয়ে থাকে গর্ভাধান সংস্কার থেকে। গর্ভাধান সংস্কারের সময় পিতা-মাতার এইরকম একটি ভাবের পোষণ করতে হয় যে, যে সন্তানটি সদ্য জন্ম হতে যাচ্ছে তাঁকে আমরা পূর্ণরূপে সাহায্য করব, যাতে সে এই জীবনেই ভগবানের কাছে ফিরে যেতে পারে। এই জন্যই সন্তানের বয়স যখন পাঁচ বছর হত, তখন তাদের গুরুকুলে শিক্ষাদানের জন্য পাঠানো হত। এইভাবে যখন সেই ছেলে পাঁচিশ বৎসর বয়সে উন্নীর্ণ হয়, তখন সে গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করে। এভাবে ক্রমশ গৃহস্থ আশ্রম থেকে পূর্বে গুরুগৃহে যে জ্ঞান লাভ করেছিল, সেই জ্ঞানের অনুশীলন করার মাধ্যমে ভগবানের কাছে ফিরে যাবে। এটা সম্ভব হয়ে থাকে বিশেষ করে যে সমস্ত মায়েরা ভক্ত হয়ে থাকেন। যখন একটি মায়ের

গর্ভে একটি ছেলে বা মেয়ের জন্ম হয় তখন বুঝতে হবে যে সেই ছেলেটি তার পূর্ব জীবনে কৃষ্ণভাবনা সম্পূর্ণ করে নি, তাই সে এই জীবনে একজন ভক্ত মায়ের গর্ভে এসেছে তার ভক্তি জীবনকে পূর্ণ করার জন্যে। এইজন্য সেই সন্তানটিকে পূর্ণ সুযোগ সুবিধা যুগিয়ে দিতে হবে যার ফলে সে এই জীবনে ভগবানের কাছে ফিরে যেতে পারে, এই জগতে তাকে যেন পুনর্বার জন্মগ্রহণ করতে নাহয়।

কিন্তু এই রকম একটি সুন্দর অনুশীলন করজন মানুষ করছে? অনুশীলন করা তো দূরের কথা, এই সম্পর্কে আলোচনাও করা হয় না। তাহলে চিন্তা করলে দেখা যায় যেখানে এই রকম আলোচনাও হয় না, সেখানে কিরকম সন্তান জন্মালাভ করতে পারে? তার মানে বলা যেতে পারে, এখানে সবাই বর্ণসংকর বা অবাঞ্ছিত। আমাদের যাঁরা উচ্চপদস্থ আছেন তারা চিন্তা করছেন সমাজে কেন শান্তি নেই। এখানে প্রশ্ন হতে পারে তাহলে আপনি কি যথার্থ নিয়মের মাধ্যমে গর্ভাধান সংস্কার করেছেন সুসন্তান লাভের জন্যে? তাই আপনি যদি এই সমস্ত সংস্কার সঠিক নিয়মে পালন না করেন, তাহলে আজকের এই বিশ্বাল সমাজের জন্য আপনিও দায়ী।

আপনার একটি সন্তান জন্ম দেওয়ার কারণটি কি আছে, তার ভবিষ্যতটিকে আপনি কিভাবে গড়ে তুলবেন। আপনি যদি আপনার সন্তানকে ভালোবেসে থাকেন, তাহলে তাদের খুব সুন্দর করে শিক্ষা দেবেন, তার যেন শারীরিক সুস্থিতা থাকে, তার বিবাহ দেওয়া, খুব সুন্দর একটি চাকুরি যাতে সে পেয়ে থাকে এইসব বিষয়েই খুব চিন্তিত থাকবেন। আমরা আমাদের ছেলে-মেয়েদেরকে খুব ভালবাসি, তাই সবচেয়ে ভাল জিনিসটাই তাদেরকে দিতে চাই। যদি আপনারা আপনাদের সন্তানদেরকে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত না করেন তাহলে আপনারা তাদেরকে কসাইখানায় প্রেরণ করছেন, এই সংসারে তাদেরকে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে প্রেরণ করছেন, তাদের প্রতি হিংসা আচরণ করছেন। জীবাত্মা ভগবানের নিত্য সেবক। যদি আপনার সন্তানকে এই ভাবনায় উদ্বৃদ্ধ না করেন তাহলে তাদের প্রতি সেই ভালবাসার মূল্য কি?

যখন কেউ কৃষ্ণভক্তের কৃপায় কৃষ্ণানুশীলন করেন, তখন তিনি সংসার চক্র থেকে মুক্তি লাভ করে ভগবানের কাছে ফিরে যান। শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তদের উদ্দেশ্যে বলেন যে আমাদেরকে জানতে হবে, আমরা আমাদের পূর্ব জন্মের সুকৃতির ফলে ভক্ত হতে পেরেছি। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে যদি কেউ পূর্ব জীবনে এই রকম কৃষ্ণভক্তিমূলক কিছু কর্ম না করে থাকে, তাহলে সে কখনই কৃষ্ণভাবনায় আসতে পারে না। এই জীবনে আমরা যে ভগবন্তি অনুশীলন করছি, তা আমাদের

পূর্ব জীবনের ভগবন্ত্বিকির শেষ পর্যায়। পূর্ব জীবনে আমরা যেখানে ভগবন্ত্বিকির শেষ করেছিলাম তারপর থেকে আমরা এখন ভগবন্ত্বিকির অনুশীলন শুরু করেছি। শ্রীল প্রভুপাদ বলেন, আমরা আমাদের পূর্ব জীবনে ভগবন্ত্বিকির সম্পূর্ণ করিনি, তাই আজকে আমরা এরকম একটি শরীর পেয়েছি। আমাদের প্রতিজ্ঞা নেওয়া উচিত যে, পূর্ব জীবনে আমি ভগবন্ত্বিকির সম্পূর্ণ করতে পারিনি, কিন্তু এই জীবনে অবশ্যই তা সম্পূর্ণ করব। ভক্ত যখন এইভাবে ভাবিত হয়, তখন তার সমস্ত সমস্যা দূরীভূত হয়ে যায়।

কলিযুগের অগ্রগতির সাথে সাথে সমাজের কোন ভাল দিকের পরিবর্তন দেখা যাবে না। যেহেতু কেউ এখন বর্ণন্মধ্য অনুশীলন করছে না, তাই এখানে আমরা অশুভ জিনিস ছাড়া আর কি আশা করতে পারি। কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন এত শক্তিশালী যে, যদি কেউ এই জন্মে বা আগের জন্মে সমস্ত নিয়ম পালন করেননি, কিন্তু তিনি যদি ভগবানের ভক্ত হন, ভগবানের নাম জপ করতে থাকেন, তাহলে তিনি অবশ্যই ভগবদ্বামে ফিরে যাবেন। বলা হচ্ছে যে, হরিনাম জপ করলে যত পাপ ক্ষয় হয়, অত পাপ করার মতো কোন পাপীর সাধ্য নেই—“এক হরিনামে যত পাপ হরে, পাপীর সাধ্য নাই তত পাপ করে।” আর এই ভক্তির পক্ষা দেখানোর জন্যই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এসেছেন। এই শিক্ষাটি তিনি অকাতরে দান করছেন এবং আপনার অভিজ্ঞতা আছে কি নেই, সেটি তিনি দেখেছেন না। তিনি তাঁর সেবা অকাতরে বিতরণ করে যাচ্ছেন। সাধারণভাবে দেখা যায় ভগবানকে সেবা করার জন্যে অবশ্যই একজনের যোগ্যতা থাকার প্রয়োজন আছে। এটি হচ্ছে নিয়ম। যেহেতু কলিযুগে কেউই যোগ্যতা সম্পূর্ণ নয়, সেইজন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্তৃক

একটি বিশেষ ছাড় দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলছেন এই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র আমি দিচ্ছি, আপনারা অবশ্যই তা গ্রহণ করুন বিনামূল্যে। আর এইভাবে কেউ যখন চৈতন্য মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে সেই অনুস্মৃতি তাঁর মধ্যে খুব বলবত হয়ে ওঠে। এটি অনুসরণ করার সাথে সাথে তার মধ্যে শুন্দতা আসে। যখন চৈতন্য মহাপ্রভুর সেবায় নিযুক্ত হওয়া যায়, তখন সমস্যাপূর্ণ জড় জগতের সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়।

সমস্ত শুন্দিকরণের যে পক্ষা গর্ভধারণ সংস্কার ইত্যাদি সবকিছু এখানে এসে পর্যবসিত হয় যেখানে সেবাই ভগবানের সেবায় ব্রতী হয়। তাই শাস্ত্রে বলা হয়েছে, যিনি ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করার মাধ্যমে নিজেকে ভগবানের সেবায় নিয়োগ করেছেন, তিনি ইতিমধ্যেই সমস্ত যাগযজ্ঞ, তপস্যা, বেদ অধ্যয়ন, পুণ্যতীর্থে স্নান ইত্যাদি এ সব কিছু শেষ করেছেন এবং বুবাতে পেরেছেন যে ভগবানের সেবাই হচ্ছে পরম উদ্দেশ্য আর সেটিই তিনি গ্রহণ করেছেন। আর আপনি যদি যাগযজ্ঞ, তপস্যা, দান, শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন, কিন্তু আপনি যদি কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত না হন, তাহলে এই সমস্ত কিছুর ফলটি আর কোন কাজে লাগে না। আর আপনি যদি কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে থাকেন, তাহলে এইসবের আর কি প্রয়োজন আছে। চৈতন্য মহাপ্রভুকে মহাবদ্বান্য বলা হয়েছে কেন? তিনি এসেছেন তাঁর সেবা অকাতরে দান করতে। তাই জীবদেরকে এই সেবায় নিযুক্ত হতে হবে, আর কোন কাজে নয়। তাই এই কৃষ্ণভাবনার অনুশীলনই হচ্ছে কলিযুগের বন্দ জীবদের উদ্ধার লাভের একমাত্র উপায়। এইভাবে কৃষ্ণের সেবা করার মাধ্যমে কৃষ্ণভাবনা গ্রহণ করার যে পক্ষা, সেটি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু খুব সাবলীল করে দিয়েছেন।



প্রশ্ন১। রাবণের বৎস খবৎস হয়ে গেল। তবুও সে সীতাদেবীকে অশোক বনে আটকিয়ে রেখেছিল কেন?

—তারকনাথ হালদার, নদীয়া

উত্তরঃ প্রবাদ বাক্য এই যে, অতি দর্পে হতা লংকা। রাবণের দর্প বা অহংকার ছিল প্রচণ্ড। সে জানকীর একমাত্র উপযুক্ত পতিরিপে নিজেকে জাহির করেছিল। জগতে অন্য সবার জীবন তার কাছে ছিল মূল্যহীন। তার মধ্যে ছিল অতি উৎ কাম। কাম বাধা পেলে ক্রোধ। ক্রোধ থেকে মোহ। মোহ থেকে বুদ্ধি অষ্ট। রাবণের বুদ্ধি অষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সেই জন্য পরস্তী হরণ, পুত্রকে যুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া, ভাই বিভীষণের সৎ পরামর্শ অগ্রাহ্য করা, মাতা-পিতার সতর্ক বার্তা অবজ্ঞা করা প্রভৃতি নিষিদ্ধ আচরণেই সে প্রবৃত্ত হয়ে ছিল। মানুষ অতির্দৰ্প এবং নিষিদ্ধ কর্ম করার বদ অভ্যাসের জন্যই পৃথিবীতে অশাস্তি সৃষ্টি করছে। তাতে নিজেরও ক্ষতি করছে অন্যেরও সর্বনাশ করছে।

প্রশ্ন২। দুর্যোধন দুরাচারী ছিল। তাহলে কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধে অধিকাংশ রাজ্য কেন তার পক্ষে যোগ দিয়েছিল?

উত্তরঃ দুর্যোধন পাণ্ডবদের সহ্য করতে পারত না। তাদেরকে মেরে ফেলে তবে সে রাজা হতে চেয়েছিল। পাণ্ডবদের সবৎশে বিনাশ করার উদ্দেশ্যে সে তাদের গৃহে আগুন ধরিয়ে ছিল। খাবারে বিষ মিশিয়ে ভীমকে মেরে ফেলার চক্রান্ত করেছিল। দ্রৌপদীকে লাঞ্ছনা করেছিল। রাজপরিবারের মধ্যে সে একটি কর্দর্য চরিত্র বটে। সেই ব্যাপারটি প্রচার হয়নি। দুরাচারী নেতাদের অনেক জঘন্য কর্ম গোপনেই থাকে। সরল শাস্তি লোকদের অনেক ছোট ছোট দোষ ফলাও করে প্রচারিত হয়। সমাজের অধিকাংশ লোকই হজুগে চলে। তারা শ্রীকৃষ্ণের শাস্তি প্রস্তাব সংবাদও শোনে না। শ্রীকৃষ্ণ যে ভগবান তাও মানে না। তারা শুধু জানে, যারা বনবাসী হয়ে দিন অতিবাহিত করছে তাদের কোনও মূল্য মর্যাদা নেই। রাজসিংহাসনে আছে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র। তার পক্ষে আছে মহান বীর ভীমদেব, কুলগুরু কৃপাচার্য, অস্ত্রগুরু দ্রোগাচার্য। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্যোধনই রাজপদে আসীন হওয়ার উন্নতরাধিকারী। অতএব চোখ বন্ধ করে দুর্যোধনকেই ভোট দেওয়া যাক। তার সাথেই দলে দলে যোগ দেওয়া কর্তব্য। তাই সেই সময়ে আমাদের দেশের পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, আসাম প্রভৃতি রাজ্য দুরাচারী দুর্যোধনের পক্ষেই যোগ দিয়েছিল।

প্রশ্ন৩। কখনো কখনো মন-মানসিকতা চথ্পল হয় এবং ইন্দ্রিয় কৃষ্ণভজন বিরোধী হয়ে বেঁকে বসে। এমন অবস্থায় মন ও ইন্দ্রিয়কে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব?

—অনসুয়া গোপিকা দেবী দাসী, হাবড়া, উত্তর ২৪ পরগণা

উত্তরঃ চারটি অভ্যাসের জন্য মন চথ্পল হয়ঃ-

- ১) কেউ কিছু বললেই তাতে অতি উৎসাহ দেখানো কিংবা অতি বিক্ষুব্ধ হওয়ার অভ্যাস।
- ২) জীবন অনিয় এটাই ভুলে যাওয়ার অভ্যাস।
- ৩) অতীতের কোনও শোচনীয় ঘটনার কথা বারবার চিন্তা করা।
- ৪) জড় ভোগ লালসা পোষণ করা।

এগুলি হরিভজনে বাধা সৃষ্টি করে। মন নিয়ন্ত্রিত ও সুন্দর হবে চারটি অভ্যাসের জন্যঃ—

১) কেউ ভালো-মন্দ যাই বলুক, প্রতিদিন সকাল সকাল সংখ্যা রেখে হরিনাম জপ করা। বহু কথা না বলে পরিবারের করণীয় কর্মসম্পাদন করা।

- ২) রোজ একটি দুটি ভগবৎ কথা অধ্যয়ন করা।
- ৩) সবার আনন্দ উৎসাহ দানসূচক আচরণ করা।
- ৪) অন্যকে ভজ্জিপথে আনতে যাত্র করা।

প্রশ্ন৪। আমাদের সমাজে ‘জীবে দয়া’ বলতে কি বোঝায়?

উত্তরঃ সমাজে তিনি রকমের মানুষ আছে। কর্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত। সমাজে এই তিনি রকমের মানুষই ‘মানব সেবা’ বা পরোপকার করেন। কর্মকাণ্ডীয় ব্যক্তিরা জীবের নিত্যমঙ্গল তত্ত্ব অব্যেষণ করেন না, জীবের কেবল দেহ সম্বন্ধীয় ও মন সম্বন্ধীয় উপকার করাকেই খুবই শুভ বলে মনে করেন। জ্ঞানকাণ্ডীয় ব্যক্তিরা জীবের মন সম্বন্ধীয় উপকার করাকেই খুবই আদর করেন। ভক্তরা জীবের আস্থা সম্বন্ধীয় এর পর ১৩ পাতায়.....





কষ্টভোগের তিন প্রধান কারণ এবং তার প্রতিক্রিয়া পুরুষোত্তম নিতাই দাস

শ্রীল রূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিঙ্কু গ্রন্থে বিশ্লেষণ করেছেন যে, আমরা শুধু এই জগতের কৃত পাপের ফলেই নয়, পূর্বজন্মসমূহে কৃত পাপের ফলেও কষ্টভোগ করি। তিনি আমাদের কষ্টভোগের প্রধান তিন কারণ এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণরূপে এর প্রতিকার ব্যাখ্যা করেছেন।

কষ্টভোগের তিন কারণ—

আমাদের কষ্টভোগের তিন কারণ হল :

১। পাপমৃৎ আমরা আমাদের পাপের কারণে কষ্টভোগ করি।

২। বীজমৃৎ আমরা আমাদের জাগতিক কামনা বাসনার জন্য কষ্টভোগ করি। এটি আমাদের কষ্টভোগের গৌণ কারণ।

৩। অবিদ্যাৎ আমাদের অজ্ঞানতাই আমাদের জাগতিক বাসনার কারণ। আমরা বুবাতে ব্যর্থ হই যে আমরা আধ্যাত্মিক জীব এবং আমাদের শাশ্঵ত পরিচয় হল আমরা কৃষের নিত্যদাস। অজ্ঞানতাই আমাদের কষ্টভোগের মূল কারণ।

চার প্রকার পাপের প্রতিক্রিয়া :

পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে পাপকর্মের চার প্রকার প্রতিক্রিয়া হয় :

চার প্রকার পাপকর্মের প্রতিক্রিয়া হল :

● যে প্রভাব এখনও ফলোন্মুখ হয়নি (অপ্রারংশ)

● যে প্রভাব ইতিমধ্যেই পরিপক্ষ (প্রারংশ)

● যে প্রভাব প্রায় পরিপক্ষ (কর্ম-বীজ) এবং এই সকল পাপকর্মের প্রতিক্রিয়ার কারণে এই জড়জগতে আমাদের অনেক কষ্ট ভোগ করতে হয়। যাই হোক, যদি আমরা শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করে শুন্দ ভক্তিমূলক সেবায় নিয়োজিত হই তাহলে এই সকল পাপকর্মের প্রতিক্রিয়াগুলি অবিলম্বে বিলুপ্ত হবে।

দেখা যাক কিভাবে ভক্তিমূলক সেবা প্রত্যেকটি পাপময় প্রতিক্রিয়াকে ধ্বংস করে :

১। ভক্তিমূলক সেবা অপ্রকাশিত পাপময় প্রতিক্রিয়াকে ধ্বংস করে (অপ্রারংশ-পাপম)

শ্রীমদ্ভাগবতে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ববকে বলছেন, “প্রিয় উদ্বব, আমার ভক্তিমূলক সেবা জ্ঞলন্ত অগ্নির মতো প্রদত্ত অপরিসীম জ্ঞালানীকে ভস্ম করে দেয়।” (ভাগবত ১১।১৪।১৯) শ্রীল প্রভুপাদ বিশ্লেষণ করছেন, “তাংপর্যহল জ্ঞলন্ত অগ্নি যেমন যে কোন পরিমাণ জ্ঞালানীকে ভস্ম করে, তেমনই কৃষ্ণভাবনায় কৃত ভগবত সেবা সকল পাপকর্মরূপ জ্ঞালানীকে প্রজ্জলিত করে।” (ভক্তিরসামৃত সিঙ্কু, শুন্দ ভক্তির লক্ষণ তাৎপর্য) সুতরাং যদি আমরা শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়

গ্রহণ করি তাহলে পরমেশ্বর ভগবান প্রতিশ্রূতি দিয়েছেন যে তিনি আমাদের সকল অপ্রকাশিত পাপকর্মের প্রতিক্রিয়াকেও (অপ্রারঞ্চ পাপম) সম্পূর্ণভাবে নাশ করবেন। এর অর্থ হলো এই যে, যে কোন পাপ যার জন্য আমাদের কষ্ট ভোগ হতে পারে তার নাশ হবে। সুতরাং অতীতে কৃত সেই সকল পাপের জন্য আমরা ভবিষ্যতে কষ্ট ভোগ করব না।

উদাহরণ স্বরূপ, মৃগারি এত নৃশংস ছিল যে পশুদের অর্ধমৃত করে তাদের মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করতে দেখে তা উপভোগ করত। এই নৃশংস কর্মের জন্য ভবিষ্যতে তার নিদারণ কষ্টভোগ করার কথা। কিন্তু যখনই সে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিমূলক সেবা গ্রহণ করল, সে সম্পূর্ণভাবে পরিশুন্দ হল এবং ভবিষ্যতের সকল কষ্ট ভোগ থেকে মুক্তিলাভ করল।

২। ভক্তিমূলক সেবা প্রকাশিত পাপকর্মের প্রতিক্রিয়াকেনাশ করে(প্রারঞ্চ-পাপম)

আমাদের অতীতের পাপকর্মের কারণেই বর্তমানে আমাদের কষ্ট ভোগ। যদি কেউ ভিখারী পরিবারে অথবা একটি অপরাধী পরিবারে অথবা মামলা মোকদ্দমায় জজরিত একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করে, কেউ অঙ্গ, বোকা, কালা রূপে অথবা জন্ম থেকে কোন রোগে আক্রান্ত তাহলে তাদের পূর্ব জন্মকৃত পাপের ফলেই এটি হয়েছে। যাই হোক, কৃষ্ণভক্তি এত পরিশোধনকারী যে, যে মানুষ তার পূর্বকৃত পাপের কারণে কষ্টভোগ করছেন তিনিও সকল কষ্ট থেকে মুক্তি পেতে পারেন। কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করার যোগ্যতা প্রত্যেকের আছে। এমনকি শ্বপচ পরিবারজাত কেউও কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ একজন স্নেহশীল পিতারূপে সর্বদা আমাদের সকল প্রকার কষ্ট থেকে মুক্ত করার জন্য প্রস্তুত থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে দেবগুরুতি ভগবান কপিলদেবের মহিমা বলছেন, “হে ভগবান, শ্রবণ এবং কীর্তন থেকে সূচনা করে নয় প্রকার ভক্তিমূলক সেবা আছে। আপনার লীলাকাহিনী শ্রবণ করে, আপনার মহিমা কীর্তন করে আপনাকে প্রণতি নিবেদন করে, যে আপনাকে চিন্তন করে এবং এইরূপে নয় প্রকার ভক্তিমূলক সেবার কোন একটি অনুশীলন করে, এমনকি যদি তিনি এক শ্বপচ বংশেও (সর্ব নিম্ন মানবজাতি) জন্মগ্রহণ করেন—অবিলম্বে যজ্ঞকর্ম করার যোগ্যতা অর্জন করেন।” (ভাগবত ৩।৩৩।১৬)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এত করণাময় যে, যদি আমরা তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করি তিনি আমাদের পূর্বকৃত ভুলগুলি ক্ষমা করেন এবং আমাদের পরিশুন্দ করেন। যাই হোক, এর অর্থ

এই নয় যে, আমরা ভগবানের কৃপার সুযোগ নেবো এবং পাপকর্ম অবিরত করে যাব এই ভেবে যে, শ্রীকৃষ্ণ আমাদের তো পরিশুন্দ করেই দেবেন। ভগবানের শুন্দ ভক্ত সর্বদা পাপ করার বিষয়ে এড়িয়ে থাকেন।

৩। ভক্তিমূলক সেবা জাগতিক বাসনাকে নাশ করে (বীজম):

পাপ থেকে মুক্ত হওয়াই যথেষ্ট নয়। আমাদের জাগতিক বাসনা থেকে মুক্ত হওয়াই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ যতক্ষণ আমাদের জাগতিক বাসনা থাকবে আমরা পাপ করব এবং সেই জন্য কষ্টভোগ করব। শ্রীমদ্ভাগবতে পরীক্ষিত মহারাজ বলছেন যে হাতি জলাশয়ে স্নান করতে যায়। হাতি তার সম্পূর্ণ দেহ পরিষ্কার করে, কিন্তু সেই জল থেকে উঠে এসে, সে তীরের ধূলা নিয়ে তার শরীরে দেয়। অনুরূপভাবে কিছু মানুষ তাদের পাপের প্রায়শিত্ব করে কিন্তু যেই কোন সুযোগ আসে পাপকর্ম করার, তারা তাতে নিয়োজিত হয়। এর ফলে তারা পুনরায় কষ্টভোগ করে। সুতরাং পাপবাসনা অথবা পাপময় স্বাভাবিক প্রবণতাকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা গুরুত্বপূর্ণ।

শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় নিলে আমরা আমাদের পাপময় বাসনা থেকে সম্পূর্ণভাবে পরিশুন্দ হতে পারি।

বৈদিক রীতিনীতি, তপস্যা, দান সাময়িকভাবে আমাদের

পাপ থেকে মুক্ত হওয়াই যথেষ্ট নয়। আমাদের জাগতিক বাসনা থেকে মুক্ত হওয়াই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ যতক্ষণ আমাদের জাগতিক বাসনা থাকবে আমরা পাপ করব এবং সেই জন্য কষ্টভোগ করব। শ্রীমদ্ভাগবতে পরীক্ষিত মহারাজ বলছেন যে হাতি জলাশয়ে স্নান করতে যায়। হাতি তার সম্পূর্ণ দেহ পরিষ্কার করে, কিন্তু সেই জল থেকে উঠে আসে, সে তীরের ধূলা নিয়ে তার শরীরে দেয়।

পাপকর্মের প্রতিক্রিয়া থেকে রক্ষা করতে পারে; কিন্তু আমাদের পাপকর্মের স্বাভাবিক প্রবণতা থেকে মুক্ত করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ অজামিল সুন্দরভাবে তার ব্রাহ্মণ্যধর্ম পালন করছিলেন কিন্তু যেহেতু তার পাপময় বাসনাসমূহ সম্পূর্ণভাবে দন্থ হয়নি তাই যখন তিনি এক বেশ্যাকে দেখলেন তখন তার পতন হল। কিন্তু পরবর্তীকালে শুধু “নারায়ণ” নাম জপ করেই যমদুতদের থেকে তিনি মুক্ত হলেন। এবং তারপর অজামিল ভক্তিজীবন অনুশীলন করে তার পাপকর্মের স্বাভাবিক প্রবণতা থেকে মুক্ত হলেন।

শুন্দভক্তি শুধুমাত্র পাপময় বাসনাকেই নির্মূল করে না, আমাদের হৃদয়কেও কৃষ্ণসেবার অভিলাষায় পূর্ণ করে তোলে। কৃষ্ণসেবার অভিলাষাই জাগতিক বাসনার প্রতিবেধক। একবার আমাদের হৃদয় কৃষ্ণসেবার আনন্দের

অভিজ্ঞতা লাভ করলে আমরা আমাদের সকল জাগতিক বাসনা পরিত্যাগ করব। যখন আমাদের পাপময় স্বাভাবিক প্রবণতা দূরীভূত হবে, আমরা আর পাপকর্ম করব না এবং আমরা আর কষ্টভোগ করব না।

৪। ভক্তিমূলক সেবা অজ্ঞানতাকে নাশ করেঃ

শ্রীল রূপ গোস্বামী বিশ্লেষণ করেছেন যে কষ্টভোগের সকল কারণের মধ্যে অজ্ঞানতাই আমাদের কষ্টভোগের মূল কারণ। অজ্ঞানতার কারণে আমরা নিজেদের আমাদের জড়দেহ, মন এবং ইন্দ্রিয়ের পরিচয়ে পরিচিত করি। সেইজন্য এই জগতে আমরা আমাদের দেহ, মন এবং ইন্দ্রিয়সকলকে তৃপ্ত করার প্রচেষ্টা করি। যত অধিক আমরা আমাদের জাগতিক ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন করি তত অধিকরণপে আমরা কল্যাণিত হই। আমরা আমাদের শ্রীকৃষ্ণের অংশ আত্মারূপে সনাক্ষণ করতে বিফল হই। সুতরাং আধ্যাত্মিক অভিলাষের অনুশীলন করার পরিবর্তে আমরা জাগতিক বাসনার চর্চা করি। জাগতিক বাসনার কারণে আমরা পাপ করি এবং কষ্টভোগ করি। যাই হোক কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করলে আমরা আলোকিত হব।

আমাদের প্রকৃত আধ্যাত্মিক পরিচয় আমাদের কাছে প্রকাশিত হবে। আমরা বুঝতে শুরু করবো যে আমরা শ্রীকৃষ্ণের অংশ আত্মা।

পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে যে “ কৃষ্ণভাবনায় কৃত্ত শুদ্ধভক্তি সর্বৈর্বাচ জ্ঞান এবং যখন সেই জ্ঞান থাকে এটি দাবানলের মতো বাসনার সকল অপবিত্র সরীসৃপকে দন্ধ করে। ” যেখানে দাবানল বনের সকল সাপকে নিধন করে, অনুরূপভাবে কৃষ্ণভক্তি এত শক্তিশালী যে অজ্ঞানরূপী সাপকে দন্ধ করে।

আমরা দেখি যে যখন শ্রীল প্রভুপাদ পশ্চাত্য দেশে গিয়েছিলেন তখন হিপিরা অনেক ন্যকারজনক কার্যে লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু যখনই তারা শ্রীল প্রভুপাদের তত্ত্ববধানে কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করতে শুরু করলেন তাদের অজ্ঞানতা নাশ হল। যখনই তারা প্রকৃত আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করলেন তারা সকল পাপময় অভ্যাস ত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণের প্রথম শ্রেণীর ভক্ত হয়ে নিজ জীবনকে নির্ভুল জীবন করে তুললেন।

সিদ্ধান্তঃ

শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি কষ্টভোগের সকল কারণ দূর করে। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিমূলক সেবাই আমাদের সকল পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র পথ এবং এর ফলে বর্তমান এবং ভবিষ্যতেরও সকল কষ্টভোগ থেকে মুক্ত হতে পারব। অতঃপর আমরা একটি আনন্দময় কৃষ্ণভাবনাপূর্ণ জীবনযাপন করতে সক্ষম হব।





চামান কালিয়া

এটি কাশ্মীরের রান্না। সেখানে পনীর বা ছানাকে ‘চামান’ বলে।

উপকরণ : পনীর ১ কিলোগ্রাম। দুধ ১ কাপ। আদাকুচি ১০ গ্রাম। মেথি ১০ গ্রাম। নুন স্বাদ মতো। হিং ১ চিমটি। হলুদ গুঁড়ো ২ চা-চামচ। দই ১ কাপ। মেথি গুঁড়ো ২ চা-চামচ। মৌরী ১ চা-চামচ। লবঙ্গ ৩টি। গরম মশলা ১ চা-চামচ। ছোট এলাচ ৬টি। বড় এলাচ, দারচিনি ও গোলমরিচ একসঙ্গে গুঁড়িয়ে নিয়ে ১ চামচ পরিমাণ।

প্রস্তুত পদ্ধতি : প্রথমে বড় বড় চোকো করে পনীর কেটে নিন। কড়াইতে তেল গরম করে পনীর টুকরোগুলো বাদামী করে ভেজে নিন।

এবার তিন লিটার পরিমাপের একটি পাত্রে ১ লিটার জল নিয়ে তাতে দুধ, আদাকুচি, মেথি, হলুদ, নুন ও সামান্য হিং মিশিয়ে ফুটিয়ে নিন। ফুটতে শুরু করলে তাতে ভাজা পনীর ফেলে হালকা আঁচে আধা ঘন্টা ফোটাতে হবে।

তারপর এই মিশ্রণ থেকে ছাকনী দিয়ে পনীরগুলো

আলাদা করে তুলে নিন। স্যুপটা আলাদা করে একটা পাত্রে নিয়ে তাতে ফেটানো দই, মেথি গুঁড়ো ও আদা গুঁড়ো মিশিয়ে কাঁটা দিয়ে ঘেঁটে দিন।

এই মিশ্রণ কড়াইতে নিয়ে হালকা আঁচে রান্না করুন। দইটিকে ভালোভাবে মেশানোর জন্য ক্রমাগত নাড়তে হবে। ফুটে উঠলে পনীরের টুকরোগুলো তাতে ফেলে প্রায় কুড়ি মিনিট ফোটান।

ইতিমধ্যে পনীর ভাজার তেল আরও একবার গরম করে তাতে লবঙ্গ, মৌরী ও হিং ফোড়ন দিন। এই মশলা দেওয়া তেল ফুটস্ত পনীরের সঙ্গে মিশিয়ে নাড়ুন।

এবার এই মিশ্রণে ছোট এলাচ, দারচিনি, বড় এলাচ ও গোলমরিচ গুঁড়ো এবং গরমমশলা মিশিয়ে ঢাকনা চাপা দিন। হালকা আঁচে দশ মিনিট রেখে নামিয়ে নিন।

অন্নের সঙ্গে এই চামান কালিয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকে ভোগ নিবেদন করুন।

– অনঙ্গ মঞ্জরী দেবী দাসী

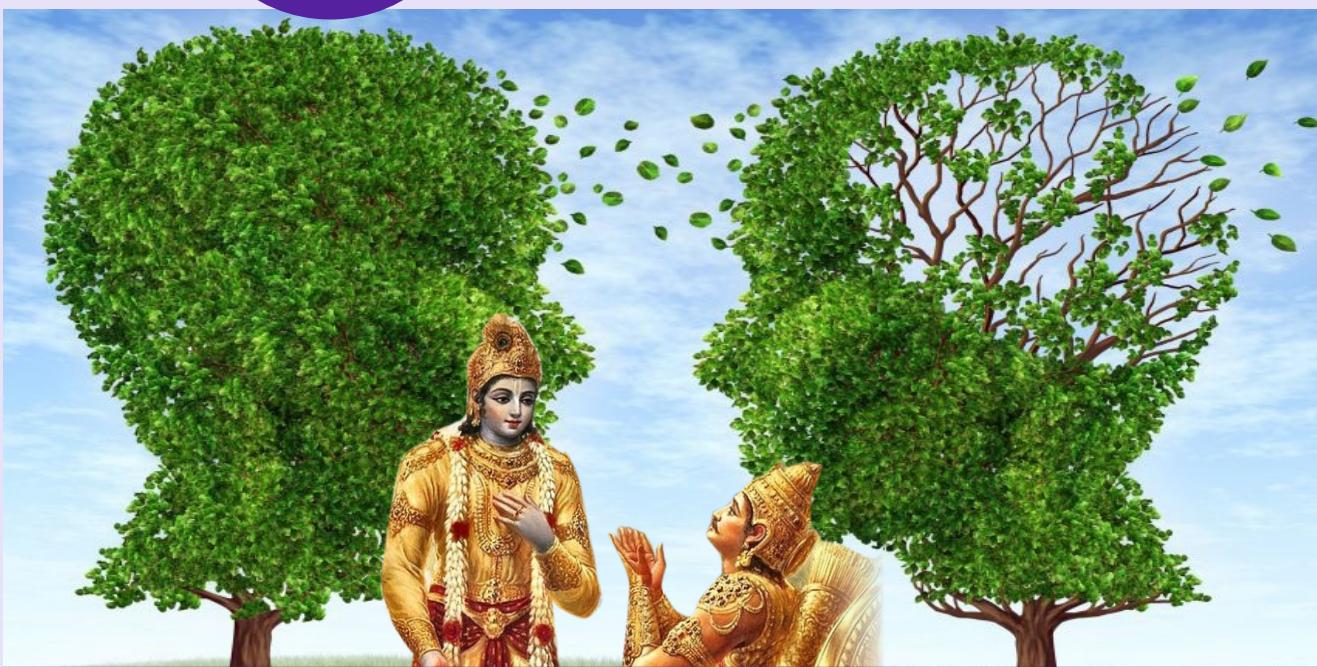
আপনাদের প্রশ্ন আমাদের উত্তর

৯ এর পাতার পর

উপকার করাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করেন।

সর্বজীবে দয়া তিন রকমের। ক্ষুধিত জীবকে ভোজন দান, পীড়িত জীবকে ঔষধ দান, ত্রিষিত জীবকে জল দান, শীতপীড়িত জীবকে আচ্ছাদন দান—এই সবই দেহ সম্পন্নীয় দয়া। বিদ্যাদানই জীবের মন সম্পন্নীয় দয়া। জীবকে কৃষ্ণভক্তি দিয়ে সংসারক্লেশ থেকে উদ্বার করবার যে যত্ন, সেই দয়া প্রবৃত্তি হচ্ছে আত্মা সম্পন্নীয় দয়া।

—প্রশ্নোত্তরে : সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী



শ্রীমদ্ভগবন্তীতার প্রাথমিক আলোচনায় অর্জুনের ব্রয়োদশতম প্রশ্ন কমলাপতি দাস

হরে কৃষ্ণ, শ্রীমদ্ভগবন্তীতায় অর্জুন আমাদের পারমার্থিক কল্যাণের জন্য সমগ্র গীতায় ১৬টি প্রশ্ন করেছিলেন। তার মধ্যে ব্রয়োদশতম প্রশ্নটি করেছিলেন ভগবন্তীতার ব্রয়োদশ অধ্যায়ের প্রথম নং শ্ল�কে।

প্রকৃতিং পুরুষং চৈব ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ ।

এতদ্বেদিতুমিছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ কেশব ॥

অর্জুন বললেন—হে কেশব! আমি প্রকৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়—এই সমস্ত তত্ত্ব জ্ঞানতে ইচ্ছা করি।

আমরা দেখতে পাচ্ছি এই শ্লোকে অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে ছয়টি বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এখন আমাদের মনে স্বাভাবিক প্রশ্ন আসবে অর্জুনের মনে কেন এই ছয়টি বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানার ইচ্ছা হলো—এর উত্তর হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বাদশ অধ্যায়ের ৭নং শ্লোকে বলেছেন—

ত্যোমহং সমুদ্রাত্মা মৃত্যুসংসারসাগরাঃ ।

ভবামি ন চিরাঃ পার্থম্যাবেশিতচেতসাম ॥

“হে পার্থ! আমাতে আবিষ্টচিন্ত সেই সমস্ত ভক্তদের আমি মৃত্যুময় সংসার সাগর থেকে অচিরেই উদ্ধার করি।” এই শ্লোককে কেন্দ্র করেই ভগবন্তীতার ব্রয়োদশ অধ্যায় শুরু হয়েছে। তখন অর্জুনের মনে প্রশ্নের উদয় হলো, জীব চিন্ময় জগতে অবস্থান করে—তাহলে এই জড়াপ্রকৃতির সংস্পর্শে এলো কিভাবে এবং এই জড় জগতে এসে কিভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়ল এবং এখন থেকে উদ্ধারের সহজ ও সরল উপায় কি?

এই সম্বন্ধে পরিপূর্ণভাবে জ্ঞানার ইচ্ছা প্রকাশ করেই অর্জুনের এই প্রশ্ন।

ভগবান সুন্দরভাবে উত্তর দিলেন ২নং শ্লোকে তৃতীয় ও চতুর্থ নং বিষয় সম্বন্ধে। এই দেহটিকে বলা হয় ক্ষেত্র এবং যিনি এই ক্ষেত্র সম্বন্ধে জ্ঞানেন তাঁকে বলা হয় ক্ষেত্রজ্ঞ। এই দেহটি হচ্ছে বদ্ধ জীবের কর্মক্ষেত্র। বদ্ধ জীব ইন্দ্রিয় ভোগ করতে চায় এবং তার ইন্দ্রিয় ভোগ করার ক্ষমতা অনুসারে ভগবানের ইচ্ছায় প্রকৃতি তাকে একটি জড় শরীর দান করেন। সেই শরীরটাই হলো কর্মক্ষেত্র। এই শরীর দিয়ে যেমন কর্ম করবেন তেমন ফল পাবেন। যেমন ক্ষেত্র মানে জমি সকলেই জানে—অর্থাৎ শরীর রূপী ক্ষেত্রে যেমন বীজ বপন করবেন রক্ষণা-বেক্ষণ করবেন তেমন ফসল পাবেন—আর শরীররূপী জমির মালিক কে? আপনি অর্থাৎ আত্মা। একটি জমির মালিক যেমন আপনি আর এই জমির পরম মালিক হলেন সরকার, আসলে সরকার হলেন সমস্ত জমির মালিক ঠিক তেমনি আমাদের দেহের মালিক যেমন আত্মা ঠিক তেমনি পরম মালিক হলেন পরমাত্মা। আসলে পরমাত্মা হলেন সমস্ত জীবের মালিক তাই ক্ষেত্রজ্ঞ হলেন আত্মা ও পরমাত্মা। ক্ষেত্রজ্ঞ মানে মালিক।

এখন কেউ প্রশ্ন করতে পারেন বিভিন্ন বস্তুর সংমিশ্রণে জমির মাটি তৈরী হয় তাহলে শরীররূপী কর্মক্ষেত্র কিভাবে তৈরী হয়। চরিষ্ণু তত্ত্বের সংমিশ্রণে একটি শরীর হয়—

১) পঞ্চমহাত্মত (মাটি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ)

- ২) পঞ্চজনেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও হৃৎক)
- ৩) পঞ্চকমেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ)
- ৪) পঞ্চতন্মাত্র (রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ)
- ৫) অন্তরিন্দ্রিয়—মন, বৃদ্ধি ও অহঙ্কার।
- ৬) প্রধান (তিনগুণের সাম্যাবস্থা)

আমাদের এটাও জানা দরকার যে ক্ষেত্র অস্থায়ী ও জড় বস্তু। তাই ক্ষেত্রের অর্থাৎ এই জড় শরীরের ছয়টি পরিবর্তন দেখা যায়—গাছপালা, পশু বা মানুষের শরীর হোক—দেহের জন্ম হয়, বৃদ্ধি হয়, স্থিতি হয় (অর্থাৎ কিছুদিন থাকে), বংশ বৃদ্ধি হয়, তারপর ক্ষয় হয়, এবং অবশেষে তা বিনাশপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু ক্ষেত্রের মালিক ক্ষেত্রজ্ঞ (জীবাত্মা বা পরমাত্মা) এর কোন পরিবর্তন হয় না।

পঞ্চম বিষয় হলো—জ্ঞান কি? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ৩০ং শ্লোকে উত্তর দিলেন—ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে যথাযথ ভাবে জানাই হলো জ্ঞান। আর এই জ্ঞান সম্বন্ধে পূর্ণ ধারণা লাভের জন্য ভগবান ৮৩ং শ্লোক থেকে ১২৩ং শ্লোকে ২০টি পন্থা বর্ণনা করেছেন।

(ক) জ্ঞান লাভের পূর্ববর্তী শর্ত—১) অমানিষ, ২) দন্ত শূন্যতা, ৩) অহিংসা, ৪) ক্ষান্তি, ৫) সরলতা

(খ) জ্ঞানলাভ করতে হলে কি করতে হবে—
(৬) সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ, (৭) শৈচ, (৮) ধৈর্য,
(৯) আত্মনিধৃত, (১০) ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয়ে বৈরাগ্য,
(১১) অহঙ্কারশূন্যতা।

(গ) জ্ঞানের দ্বারা কি কি সমস্যার সমাধান হয়।—(১২) জন্ম-মৃত্যু-জরা ব্যাধির দুঃখ প্রভৃতির দোষ দর্শন, (১৩) আসক্তি শূন্যতা, (১৪) স্ত্রী-পুত্র-গৃহাদির প্রতি অভিনিবেশ রহিত।

(ঘ) জ্ঞানের মুখ্য উপাদান কি?—(১৫) সর্বদা সমচিত্ত (জড় জাগতিক লাভ ও ক্ষতিতে উল্লিখিত বা ব্যথিত না হওয়া, (১৬) শ্রীকৃষ্ণে অনন্য অব্যভিচারণী ভক্তি।

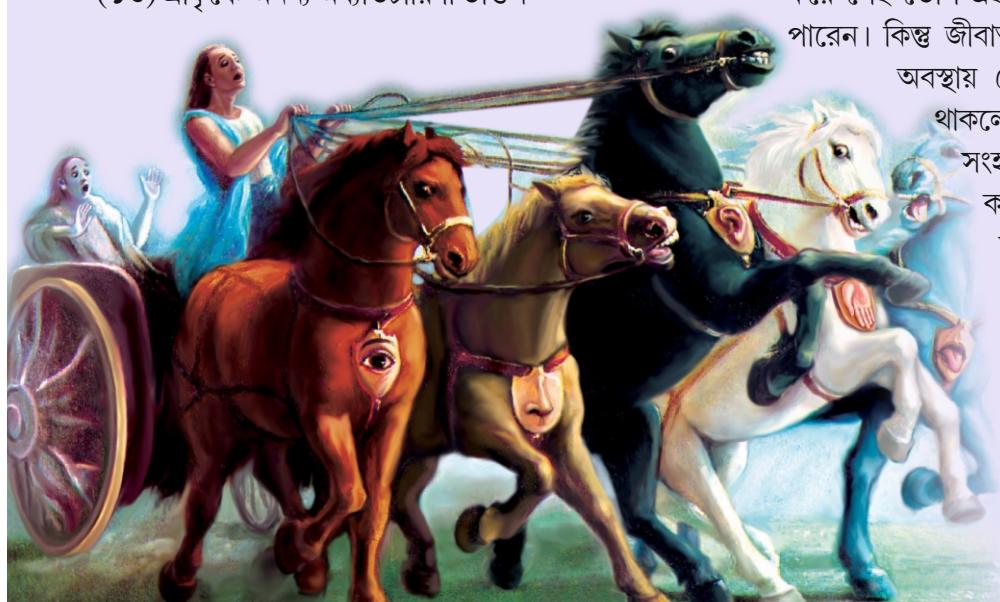
(ঙ) অনুকূল পরিবেশ—(১৭) নির্জন স্থান প্রিয়তা, (১৮) সাধারণ জনসঙ্গ-বর্জন, (চ) আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস থাকা, (১৯) আঝোপলদ্বির গুরুত্ব স্বীকার, (২০) পরমতত্ত্ব অনুসন্ধানে ঐকান্তিক আগ্রহ।

এই দিব্য গুণগুলি যদি জ্ঞানীরা অর্জন করে ভগবন্তুক্তিতে যুক্ত না হয় তাহলে কেবল সেগুলি জ্ঞান সিদ্ধির জন্যই হয়ে থাকে, আর এই দিব্য গুণাবলী খুব সহজেই লাভ করা যেতে পারে যদি কেউ অনন্য ভাবে ভগবন্তুক্তিতে যুক্ত হয়। এখন কেউ প্রশ্ন করতে পারেন দিব্য গুণাবলীর মধ্যে জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি আদি জাগতিক দুঃখ-দুর্দশার কথা এখানে কেন উল্লেখ করেছেন? এর উত্তর হলো, জড়-জাগতিক জীবন সম্বন্ধে হতাশাজনক দৃষ্টিভঙ্গী না এলে মানুষ পারমার্থিক উন্নতি সাধনের ব্যাপারে আগ্রহী হবে না। বিশেষ করে এই যুগের জন্য জীবনকে সুখ ও আনন্দময় করে তোলার সর্বোত্তম উপায় হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করা, কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণ, শ্রীমদ্বিগুণাত্মকা, ভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও শ্রবণ এবং বিগ্রহ আরাধনা।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এরপর জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে বলবেন যেটি ছিল জ্ঞেয় এটি ছিল অর্জুনের সঠ জিজ্ঞাসা। জ্ঞেয় মানে জ্ঞানের বিষয় কি? ভগবান তা বলবেন ১৩৩ং শ্লোক থেকে ১৯৩ং শ্লোক পর্যন্ত জ্ঞানের বিষয় হচ্ছে আত্মা ও পরমাত্মা উভয়ের সম্বন্ধে জানা। শ্রীল প্রভুপাদ ১৩৩ শ্লোকে তাৎপর্যে উল্লেখ করেছেন—পরমেশ্বর ভগবান যেমন অনাদি তেমনি জীবাত্মা ও অনাদি। পরমেশ্বর ভগবানের থেকে কিভাবে জীবাত্মার প্রকাশ হল, তারও কোন ইতিহাস নেই—তাই তা অনাদি। ১৫৬ং তাৎপর্যে উল্লেখ আছে জীবাত্মার ও চিন্ময় ইন্দ্রিয় আছে। কিন্তু বদ্ধ অবস্থায় তা জড় গুণের দ্বারা আচ্ছাদিত। কিন্তু পরমাত্মার ইন্দ্রিয়গুলি জড়গুণের দ্বারা আচ্ছাদিত নয়। তাই আমরা যখন ভোগ লাগাই তিনি বহুদূরে থাকলেও হস্ত প্রসারিত করে সেই ভোগ গ্রহণ করেন। তিনি সীমাহীন বর্ধিত করতে পারেন। কিন্তু জীবাত্মা তা পারে না। তার হাত-পা সীমিত

অবস্থায় থেকে যায়। পরমাত্মা সর্বজীবের মধ্যে থাকলেও তিনি অখণ্ড, তিনি সর্বভূতের পালক,

সংহার কর্তা ও সৃষ্টিকর্তা। একজন ব্যক্তি প্রশ্ন করেছিলেন ভগবানের পক্ষে কি করে সম্ভব সৃষ্টি করা, পালন করা ও ধ্বংস করা। শ্রীল প্রভুপাদ ভাৰত ১৪৮২। এই সুন্দরভাবে উত্তর দিয়েছেন। একটি নগন্য মাকড়সা যদি তার ইচ্ছানুসারে জাল সৃষ্টি করতে পারে, তা পালন করে এবং তার ইচ্ছানুসারে জাল গুটিয়ে নিতে পারে,



তাহলে পরমেশ্বর ভগবান কেন তাঁর ইচ্ছার দ্বারা জড়জগৎ সৃষ্টি, পালন এবং ধ্বংস করতে পারবেন না?

অর্জুনের ছয়টি বিষয় জানার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন ভগবান প্রথম দুটির উত্তর না দিয়ে বাকী চারটি বিষয়ের উত্তর দিয়েছিলেন। এখন প্রথম দুটির উত্তর দেবেন ২০নং শ্লোক থেকে প্রকৃতি মানে—জড়া প্রকৃতি আর পুরুষ মানে ভোক্তা। প্রকৃত ভোক্তা হলেন পরমেশ্বর ভগবান। গীতায় পঞ্চম অধ্যায়ের ২৯ নং শ্লোকে উল্লেখ আছে—

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্।

সুহাদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥।

“আমাকে সমস্ত যজ্ঞ ও তপস্যার পরম ভোক্তা, সর্বলোকের মহেশ্বর এবং সমস্ত জীবের সুহাদরণপে জেনে যোগীরা জড় জগতের দুঃখ দুর্দশা থেকে মুক্ত হয়ে শান্তি লাভ করেন।”

কিন্তু জীব যখন এই জড়দেহের মাধ্যমে কর্ম ও কর্মের ফল ভোগ করে তখন জীব নিজেকে ভোক্তা বলে মনে করে—তখন ভগবান তাকে এই জড়া প্রকৃতিতে পাঠিয়ে দেন। তাই মহাপ্রভুর একজন বিশেষ পার্বদ জগদানন্দ পণ্ডিত প্রেমবিবর্ত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—

“কৃষ্ণ-বহিমুখ হওয়া ভোগ-বাঞ্ছা করে।

নিকটস্থ মায়া তারে জাপাত্তিয়া ধরে।”

যেই মুহূর্তে কেউ কৃষ্ণের প্রতি বিদ্যেষ ভাবাপন্ন হয়ে ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের বাসনা করে, সেই মুহূর্তেই ভগবানের মায়াশক্তি তাকে জড় বন্ধনে আবদ্ধ করে। যখনই জীব কৃষ্ণ থেকে আলাদা হওয়ার ইচ্ছায় অর্থাৎ বহিমুখ হওয়ার ইচ্ছায় ভোগ করবে বাসনা করেছে—সেই মুহূর্তে জীব এই জড় জগতে এসেছে। এখন কি ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল বা কেনই ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল বা কখন ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল তার কোন উল্লেখ নেই। তাই জীবকে বলা হয় অনাদি। “কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহিমুখ।” জীব পূর্ব বাসনা, কর্ম ও গুণ অনুযায়ী নতুন দেহ লাভ

করে। আর দেহ লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে জড়াপ্রকৃতির নিয়মের অধীনে স্ব স্ব স্বভাব প্রকাশ পায় কিন্তু ভগবান দেখেন আমাকে ছেড়ে কোথায় যায় তাই পরমাত্মা রূপে সব সময় আমাদের সঙ্গে থাকেন—কখন আবার আমার কাছে ফিরে আসবেন সেই অপেক্ষায় থাকেন। ভগবান তাই সর্বক্ষণ তার অন্তর থেকে এবং বাইরে থেকে উপদেশ দিচ্ছেন “উপদ্রষ্টানুমস্তা চ” বাইরে থেকে তিনি ভগবন্তী রূপে উপদেশ দিচ্ছেন এবং অন্তর থেকে পরমাত্মা রূপে জীবের দৃঢ় প্রত্যয় উৎপাদন করার চেষ্টা করছেন। তিনি বলছেন, “এই সব কিছু পরিত্যাগ করে আমার প্রতি বিশ্বাসভাজন হও, তা হলেই তুমি সুখী হতে পারবে।”

এখন আমাদের মনে একটা স্বাভাবিক জিজ্ঞাসা চলে আসে ভগবান তাহলে কেন বললেন ১৫/৬নং শ্লোকে “যদি গত্বা ন নিবর্তন্তে তন্মাম পরমং মম।” “আমার ধামে যদি একবার কেউ আসে তাহলে তাকে আর এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না।” তাহলে কিভাবে আমরা ভগবানের ধাম থেকে এই দুঃখপূর্ণ জড়জগতে এলাম। শ্রীল প্রভুপাদ ১৫।৭ নং শ্লোকের তাৎপর্যে উল্লেখ করেছেন—আমরা যেহেতু ভগবানের ক্ষুদ্রতিক্ষুদ্র অংশ হবার ফলে ভগবানের গুণাবলীর অনুসন্ধৃশ স্বতন্ত্র গুণ আমাদের মধ্যে আছে। সেই ক্ষুদ্র স্বাধীনতার অপব্যবহার করার ফলে জীব বদ্ধ হয়ে পড়ে এই জড় জগতে। জীব যেহেতু ভগবানের তটস্থা শক্তি তাই গোলোকে ফিরে গেলেও তটস্থা শক্তির পরিবর্তন হয় না। তাই গোলোকবৃন্দাবন গেলেও জীবের ইচ্ছার পরিবর্তন হতে পারে।

শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন যদি কেউ এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পুনরায় ভগবৎ ধামে ফিরে যেতে চায় তাহলে তাকে অবশ্যই সাধু, গুরু, বৈষ্ণবের কাছ থেকে ভগবানের কথা শ্রবণ করতেই হবে এবং বিশেষ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

এই মহামন্ত্র নিষ্ঠার সঙ্গে শ্রবণ করতে হবে।





সখা বৎসল ভগবান শ্রীরামচন্দ্র

স্বরাট মুকুন্দ দাস

আদি কবি মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদি মহাকাব্য, অযোধ্যাকাণ্ড পঞ্চাশ, একান্ন ও বাহান সর্গ। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের ভোজরাজ্যে গমন, গঙ্গার শোভাদর্শন এবং নিষাদরাজ গৃহকের সঙ্গে মিলন এবং সখ্যরসের লীলা বিলাস।

লক্ষ্মণের অগ্রজ ভগবান শ্রীরামচন্দ্র বিশাল এবং মনোরম কোশলদেশ অতিক্রম করে অযোধ্যা অভিমুখে করজোড়ে নিবেদন করলেন, “হে অযোধ্যা, আপনি নগরী সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আমি আপনাকে বিদায় জানাই, যে সকল দেবতা আপনাকে পালন করছেন এবং আপনার মধ্যে বাস করেন আমি তাদেরও বিদায় জানাই।” অতঃপর সুঠাম দেহী, উজ্জল অঙ্গকাস্তি, সুললিত নয়ন, পরম স্নেহময় দৃষ্টিতে শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যাবাসী জনগণকে বললেন, “তোমরা আমার প্রতি অতিশয় সন্ম্যান এবং প্রীতি প্রদর্শন করেছো, আমি অতিশয় সম্পৃষ্ট। এখন তোমরা অযোধ্যায় ফিরে যাও।” এই বাক্য শ্রবণ করে তাদের হৃদয় বিদীর্ঘ হলো। তারা ভগ্ন হৃদয়ে তাদের পরমপ্রিয় প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন, কেউ কেউ প্রদক্ষিণ কালে বিলাপরত অবস্থায় ভুলুঁষ্ঠিত হলেন এবং বারবার শ্রীরামচন্দ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করে তাদের অস্তিম

আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার প্রয়াস করতে লাগলেন। এইসম্পর্কে ক্রমে তাদের পরমপ্রিয় শ্রীরামচন্দ্র তাদের দৃষ্টির অগোচর হলেন। তারপর তিনি কোশলদেশ অতিক্রম করলেন। সেই সব রাজ্য ছিল আনন্দপূর্ণ। এইভাবে ভ্রমণ করতে করতে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ঝুঁঝিগণ সেবিত পাপানাশিনী, পৰিব্রত্রঙ্গিনী গঙ্গা নদীকে দেখলেন। শ্রোতৃস্থিনীর সুশীতল জলরাশি নিকটে বহু সুন্দর আশ্রম এবং তা গঙ্গার শোভা দ্বারা শোভিত। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র শ্রোতৃস্থিনী ও আবর্তসঙ্কুল গঙ্গাকে দর্শন করে সেখানেই অবস্থান করার মনস্ত করলেন। শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ এবং সুমন্ত্রকে বললেন, “এই বিশাল সুন্দর ইঙ্গুদি বৃক্ষ দেখছ, আমরা আজ এখানেই অবস্থান করব।” এই বলে শ্রীদশরথনন্দন সীতাদেবী ও লক্ষ্মণকে নিয়ে রথ থেকে মাটিতে অবতরণ করলেন। সুমন্ত্রও রথ থেকে নেমে এসে অশ্বগুলিকে রথ থেকে মুক্ত করে শ্রীরামচন্দ্রের নিকট করজোড়ে উপস্থিত হলেন। এই স্থানটি ছিল নিষাদরাজ গৃহকের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। যখন নিষাদরাজ গৃহক এই সংবাদ পেলেন যে নরশ্রেষ্ঠ ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তাঁর অপার করণা বশতঃ তার রাজ্য আগমন করেছেন তিনি অসীম আনন্দ, শন্দীয় পরিপূর্ণ হয়ে



আবেগমথিত হলেন।

প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের আগমন বার্তায় মহানন্দে বর্যায়ান অমাত্য ও আত্মীয়বর্গদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে তাঁর প্রভু শ্রীরামচন্দ্র দর্শন এবং তাঁর সুস্থাগতম করার নিমিত্তে তিনি কালক্ষয় না করে সেই স্থানে উপস্থিত হলেন। নিয়াদরাজ গুহক ছিলেন ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের প্রাণপ্রিয় বন্ধু। জাতিতে নিয়াদ এবং বলবান ও স্থপতি বলে তার বিশেষ খ্যাতি ছিল। এখানে শ্রীভগবানের সকলের প্রতি সমভাবাপন এবং সমদৃষ্টি পূর্ণ গুণটির পরিপূর্ণ হতে দেখতে পাওয়া যায়। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন ক্ষত্রিয় রাজকুমার এবং নিয়াদরাজ ছিলেন তাঁর অপেক্ষা নিচুজাতি সম্পন্ন রাজা, তথাপি তার সঙ্গে তাঁর সখ্যতার এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কটিকে ভগবান অতি দৃঢ়তার সঙ্গে স্বীকার করেছিলেন।

নিয়াদরাজকে দূর থেকে উপস্থিত দেখে, লক্ষণ সহযোগে শ্রীরামচন্দ্র গুহকের দিকে অগ্রসর হলেন। গুহক শ্রীরামচন্দ্রকে যথোচিত শুন্দা জ্ঞাপন করে শ্রীরামচন্দ্রের বসন ভূষণ দেখে অত্যন্ত কাতর দৃষ্টিতে কিছু নিবেদন অভিলাষকালেই শ্রীরামচন্দ্র তাকে প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন। পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শ্রীঅঙ্গের স্পর্শে গুহক প্রেমাবেশে পুলকিত এবং কম্পিত হলেন। তিনি গদগদ স্বরে বললেন, “হে শ্রীরাম, অযোধ্যা যেমন এই স্থানটিও তেমনি। আপনি অনুগ্রহ করে বলুন আমি কি রূপে আপনার সেবা করতে পারি। আমি অঘ-ব্যঞ্জনাদি, অর্ধ্য, বসন ভূষণ সমস্ত কিছুই নিয়ে এসেছি এবং আপনার শ্রীচরণ কমলে তা নিবেদন করছি, আপনি অনুগ্রহ পূর্বক তা প্রত্যু করুন। এই সম্পূর্ণ নিয়াদ রাজ্য আজ থেকে আপনার। আমরা সকলেই আপনার নগণ্য ভূত্য মাত্র। আপনি আমাদের সকলের প্রভু। এখন থেকে আমরা আপনার শাসনাধীন। হে পরম পুরুষ, আপনি আপনার শ্রীচরণকমলে আমাদের আশ্রয় দান করুন।” গুহকের এই আত্মনিবেদন এবং শরণাগতিতে শ্রীরামচন্দ্র অত্যন্ত প্রীত ও সন্তুষ্ট হয়ে বললেন,

“তোমার প্রীতি ও আত্মনিবেদনে আমি অভিভূত। আমার অনেক সৌভাগ্য যে তোমায় আমি সবান্ধের দর্শন করছি। তোমার বনবাজ্যের কুশল তো? প্রীতিবশতঃ তুমি যা কিছু এনেছ আমি তা সবই স্বীকার করে নিলাম কিন্তু বর্তমানে আমি বনবাসী, তপস্যাবৃত থহণ করেছি তাই এখন প্রতিগ্রহ করতে পারি না।” এই বলে শ্রীরামচন্দ্র অতি বিনয়ের সঙ্গে নিয়াদরাজকে বিরত করলেন।

পরে লক্ষণের আনা ফলমূল জল এবং আহার্য থহণ করলেন। তারপর তিনি একটি বৃক্ষের নীচে সীতামাতা সহ ভূমিতে শয়ন করলেন। কৌশল্যানন্দন পরমেশ্বর শ্রীরামচন্দ্র কষ্ট বা দুঃখ কাকে বলে তা কখনও দেখেননি। সর্বদা মহাসুখে লালিতপালিত। এইভাবে তাঁকে শয়ন করতে দেখে নিয়াদরাজ গুহক ও লক্ষণ অতি যন্ত্রণাবিন্দু অবস্থায় শ্রীরাম ও সীতামাতার প্রহরায় রাত্রি অতিবাহিত করতে লাগলেন। আজ এই রূপে যড়ঐশ্বর্যপূর্ণ ভগবানকে ভূমিতে শয়ন করতে দেখে রাত্রিদেবীও কাতর হয়ে অনতিবিলম্বে প্রভাত করে দিলেন।

এইরূপে রাত্রি অতিবাহিত হলে মহাযশ্শী শ্রীরামচন্দ্র



লক্ষ্মণকে বললেন, “লক্ষ্মণ ! নিশাকাল অতিক্রান্ত, সূর্যের উদয় কাল উপস্থিতি। ক঳েলিনী, সাগরগামিনী গঙ্গা আমরা এখন অতিক্রম করব।” এই কথা শ্রবণ করে সকলের আনন্দবর্ধক শ্রীলক্ষ্মণ নিষাদরাজ গুহককে সঙ্গে নিয়ে শ্রীরামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হলেন। গুহক তার প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের গঙ্গা অতিক্রমের ইচ্ছা এবং নির্দেশ শ্রবণ করে তার অমাত্যবর্গকে একটি সুন্দর ও সুন্দর্য নৌকার ব্যবস্থা করতে বললেন। গুহকের আদেশ মতো তার অমাত্যবর্গ এক অতি মনোরম এবং সুসজ্জিত নৌকা প্রস্তুত করলেন। অতঃপর গুহক শ্রীরামচন্দ্রকে করজোড়ে নিবেদন করে বললেন, “প্রভু নৌকা প্রস্তুত, কিন্তু নৌকা আরোহনের পূর্বে আমার এক নিবেদন আছে, প্রভু,” শ্রীরাম জিজ্ঞাসা করলেন, “কি নিবেদন।” গুহক স্মিতহাস্যে প্রভুকে বললেন, “নৌকাটি অতি পরিচ্ছন্ন এবং আপনার শ্রীচরণকমল ধূলি ধূসরিত, তাই নৌকাকে আরোহনের পূর্বে আপনার পাদপ্রক্ষালন প্রয়োজন।” আপাত দৃষ্টিতে অসম্ভব নিবেদন মনে হলেও, অস্তর্যামী ভগবান তাঁর শুন্দ ভক্তের মনোভাবটি অনুধাবন করতে পারেন। উপস্থিত অন্য সকলে বিস্মিত ও রাগান্বিত হলেও ভক্তবৎসল, সখাবৎসল শ্রীভগবান কিরণে

তাঁর ভক্তের মনোবাঞ্ছা অপূর্ণ রাখেন ? তিনি সানগে সম্মত হলেন। শুন্দভক্ত কখনই তার প্রভু পরমেশ্বর ভগবানের সেবার কিঞ্চিত সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হতে চান না। এই ভাবটিকে অক্ষুণ্ণ রেখে নিষাদরাজ গুহক স্বয়ং তার পরিবার সহযোগে পরম শ্রদ্ধা এবং ভক্তিসহকারে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পাদপ্রক্ষালন মহোৎসব পালন করলেন এবং শ্রীভগবানের পাদোদক প্রহণ করে সপরিবারে প্রেমভক্তি লাভ করলেন। শ্রীভগবানের সঙ্গে তাঁর শুন্দভক্তের এই প্রেমের লীলাদর্শন করে জগতসংসার, দেবদেবী, যক্ষ, কিন্নর সকলেই প্রেমাবেশে মথিত হলেন।

অতঃপর শ্রীরামচন্দ্র নিষাদরাজ গুহককে রাজতন্ত্র পালনের নির্দেশ দিলেন। শাস্ত্রবিধি মেনে তিনি গঙ্গানদীর জলে আচমন করলেন এবং গঙ্গা নদীকে সশন্দ প্রণতি নিবেদন করে নৌকাতে সীতা মাতা ও লক্ষ্মণ সহ আরোহন পূর্বক সুমন্ত্র এবং নিষাদরাজ গুহককে সবিনয়ে বিদায় সম্মান দান করলেন। শ্রীভগবান এখন তাঁর পরবর্তী লীলা প্রদর্শন হেতু নাবিকদের যাত্রা করতে নির্দেশ দিলেন। সখাবৎসল ভগবান শ্রীরামচন্দ্র জয়যুক্ত হউন।



ব্রহ্মণ্ডহিতা

যাস্যেকনিষ্ঠসিতকালমথাবলম্ব
জীবন্তি লোমবিলজা জগদগুনাথাঃ।
বিষুর্মহান্স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরূষং তমহং ভজামি।।৪৮।।

যস্য—যাঁর; এক—এক; নিষ্ঠসিত—নিষ্ঠাসের; কালম—কাল; অথ—এইভাবে; অবলম্ব—অবলম্বন করে; জীবন্তি—জীবন ধারণ করে; লোম-বিলজাঃ—লোমকূপ থেকে জাত; জগৎ-অঙ্গ-নাথাঃ—ব্ৰহ্মাণ্ডের পতিগণ (ব্ৰহ্মাণ্ড); বিষুওঃমহান্স—মহাবিষ্ণু; সঃ—সেই; ইহ—এখানে; যস্য—যাঁর; কলা-বিশেষঃ—অংশের অংশ বিশেষ; গোবিন্দম—ভগবান শ্রীগোবিন্দকে; আদি-পুরূষ—আদিপুরূষকে; তম—তাঁকে; অহম—আমি; ভজামি—ভজনা করি।

ব্ৰহ্মা ও জগতের অন্যান্য পতিগণ যাঁর লোমকূপ থেকে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর এক নিঃশ্বাসকাল পর্যন্ত জীবিত থাকেন, সেই মহাবিষ্ণু যাঁর অংশের অংশ, সেই আদিপুরূষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

যাস্যেক-নিষ্ঠসিত-কালমথাবলম্ব—যাঁর (মহাবিষ্ণুর) একটি নিঃশ্বাস কাল অবলম্বন করে থাকা। মহাবিষ্ণু কারণ সমুদ্রে শায়িত আছেন। ব্ৰহ্মাণ্ডজগৎ ও বৈকৃত্জগতের মাঝখানে কারণ সমুদ্র। মহাবিষ্ণু একটি শ্বাস ছাড়লেন। তখন ব্ৰহ্মাণ্ডের চিন্মায় বীজ তাঁর লোমকূপ থেকে নির্গত হলো। তাঁর দেহ নির্গত চিন্মায় পরমাণু থেকে এক একটি ব্ৰহ্মাণ্ড সৃষ্টি হলো। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বর্ণনা আছে—

ইহো মহৎস্তো পুরূষ—‘মহাবিষ্ণু’নাম।

অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ডে তাঁর লোমকূপে ধাম।।

মহৎ অস্ত মহাবিষ্ণুর লোমকূপ থেকে অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড প্রকাশিত হয়।

গবাক্ষে উড়িয়া যৈছে রেণু আসে যায়।

পুরূষ-নিঃশ্বাস-সহ ব্ৰহ্মাণ্ড বাহিরায়।।

পুনৰপি নিঃশ্বাস সহ যায় অভ্যন্তর।

অনন্ত ঐশ্বর্য তাঁর, সব—মায়া-পার।।(মধ্য ২০।।৪৮০)

জানালার ভেতর দিয়ে যেমন ধূলি উড়ে যাওয়া-আসা

করে, তেমনই মহাবিষ্ণুর নিঃশ্বাসের সঙ্গে সমস্ত ব্ৰহ্মাণ্ড নির্গত হয় এবং পুনৰায় তাঁর শ্বাস প্রহণের সঙ্গে সেই ব্ৰহ্মাণ্ডগুলোও তাঁর দেহের মধ্যে প্রবেশ করে। মহাবিষ্ণুর অনন্ত ঐশ্বর্য জড় ধারণার অতীত।

জীবন্তি লোম-বিলজা জগদগুনাথাঃ—মহাবিষ্ণুর লোমকূপ থেকে জাত ব্ৰহ্মাণ্ডপতিগণ জন্মগ্রহণ করে এবং তাঁর এক নিঃশ্বাস কাল পর্যন্ত জীবিত থাকেন। অর্থাৎ ব্ৰহ্মা সহ ব্ৰহ্মাণ্ড সমূহের স্থিতিকাল হচ্ছে মহাবিষ্ণুর একটি শ্বাস ছাড়ার সময়টুকু মাত্ৰ। সৃষ্টি এবং ব্ৰহ্মাণ্ডপতিগণ মহাবিষ্ণুর একটি শ্বাস পর্যন্ত জীবিত থাকে। মহাবিষ্ণু শ্বাস প্রহণ কৰা মাত্ৰই ব্ৰহ্মাণ্ডসমূহ মহাবিষ্ণুর শরীরে প্রবিষ্ট হয়।

বিষুর্মহান্স ইহ যস্য কলা বিশেষঃ—সেই মহাবিষ্ণু হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের অংশের অংশ। শ্রীকৃষ্ণের অংশ শ্রীবলরাম। শ্রীবলরামের অংশ মহাবিষ্ণু। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বলা হয়েছে—

অংশের অংশ যেই, ‘কলা’ তারনাম।

গোবিন্দের প্রতিমূর্তি শ্রীবলরাম।।

তাঁর এক স্বরূপ—শ্রীমহাসংকৰণ।

তাঁর অংশ ‘পুরূষ’ হয় কলাতে গণন।।(আদি ৫।।৭৪)

শ্রীগোবিন্দের প্রতিমূর্তি বলরাম। তাঁর একটি স্বরূপ মহাসংকৰণ। মহাসংকৰণের একটি অংশ পুরূষবাতার মহাবিষ্ণু। তাঁকেই কলা বা গোবিন্দের অংশের অংশ বলে গণনা করা হয়।

গোবিন্দমাদি পুরূষং তমহং ভজামি—মহাবিষ্ণু যাঁর অংশের অংশ বা কলাবিশেষ, সেই আদিপুরূষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

৮৬৪ কোটি বছরে ব্ৰহ্মার ২৪ ঘণ্টা বা একটি দিন। এইরকম ৩০ দিনে ব্ৰহ্মার একমাস। এইরকম ১২ মাসে ব্ৰহ্মার একবছর। এরকমভাবে ব্ৰহ্মার আয়ুক্ষাল ১০০ বছর। আমাদের পৃথিবীর মনুষ্যগণের হিসাবে সেই আয়ুক্ষালটি হলো = ৩১,০৪০,০০০,০০০,০০০ বছর। এতগুলো বছর মহাবিষ্ণুর একটি শ্বাসকাল মাত্ৰ। অনন্ত কাল প্রবাহের কাছে এভাবে ব্ৰহ্মা বা ব্ৰহ্মাণ্ডের আয়ুক্ষাল বুদ্বুদের মতো অত্যন্ত ক্ষণিক।

—সনাতনগোপাল দাস ব্ৰহ্মচাৰী

আপনি কি ভগবৎ-দর্শন পাচ্ছেন না ?
পাঠক ভিক্ষা ও অনুসন্ধানের জন্য যোগাযোগ করুন :
9073791237

বুক পোস্টে ভগবৎ-দর্শন না পেলে রেজিস্টার্ড পোস্টে পরিবর্তন কৰা যেতে পারে।



বিশ্বব্যাপী কৃষ্ণভাবনামৃতের কার্যাবলী

একচক্রা মন্দিরে নিত্যানন্দ অয়োদশী মহোৎসব



শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব স্থান শ্রীএকচক্রা ধামের ইস্কন্দ মন্দিরে ১৪ই ফেব্রুয়ারী ২০২২, সোমবার মহা আড়ম্বরে জাঁক জমকের সাথে পালিত হল শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব তিথি মহোৎসব।

প্রতি বৎসরের ন্যায় তিনিদিন ব্যাপী (১২ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১৪ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত) এই বিরাট মহোৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রতি বৎসর এই শুভ তিথিতে লক্ষাধিক মানুষের জনসমাবেশ হয়, একচক্র ধামে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর দর্শন এবং কৃপালাভের উদ্দেশ্যে, এবছরও তার অনাথ হয়নি। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত যেমন শ্রীধাম মায়াপুর, দুর্গাপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, প্রভৃতি থেকে জনসমাবেশ হয়। বিশেষ ব্যক্তিগত হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক, বিধান সভার ডেপুটি স্পীকার শ্রীমান আশীষ ব্যানার্জী মহাশয় এবং গুরুবর্গাদের মধ্যে ছিলেন শ্রীমৎ গৌরাঙ্গপ্রেম মহারাজ, শ্রীমৎ ভক্তিবিজয় ভাগবত স্বামী মহারাজ, শ্রীপাদ সংকর্য নিতাই প্রভু, শ্রীপাদ নাড়ু গোপাল প্রভু। উপস্থিত মহারাজ ও বরিষ্ঠ ভক্তদের দ্বারা ঐদিন সকাল থেকে নিত্যানন্দ কথা পরিবেশিত হয়। মন্দির খুব সুন্দর রঙিন পুষ্প দিয়ে সাজানো হয়, মন্দিরের শ্রীবিঘ্ন শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র গৌরাঙ্গ রায় এবং শ্রীশ্রীরাধাবৃন্দাবন মোহন খুব আকর্ষণীয় রাজবেশ শৃঙ্গারের দ্বারা সজ্জিত হয়ে ভক্তদের

দর্শন দেন। এরপর বিশ্ববাসীর কল্যাণার্থে শান্তিযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় এবং সকাল ১০টা থেকে মন্দিরে শ্রীউৎসব বিগ্রহের মহা অভিযেক পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

তারপর দুপুর ১২টায় স্থানীয় ভক্তদের তৈরী ২৫১টিরও অধিক প্রকার ব্যঙ্গন দ্বারা ভগবানের ভোগ নিবেদন করা হয়। দুরদুরান্ত থেকে আগত ভক্তদের সকলকে অন্ন প্রসাদ বিতরণ করা হয়। প্রায় তিরিশ হাজারেরও অধিক মানুষ বসে প্রসাদ প্রহণ করে। অনুষ্ঠানের একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল তিন দিন ব্যাপী কীর্তন মেলা সকাল ১০টা থেকে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত। দেশী বিদেশী বহু শিল্পী এই কীর্তনমেলায় অংশগ্রহণ করে। কীর্তন, আরতি, অভিযেক প্রভৃতিতে যোগদান করে নৃত্য-গীতের মাধ্যমে দর্শনার্থী এবং সকল ভক্তবৃন্দ প্রভৃত আনন্দ উপভোগ করেন।



লতা মঙ্গেশকরের মৃত্যুতে ইস্কন্দ শোক জ্ঞাপন করল

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্কন্দ) সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী লতা মঙ্গেশকরের মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপন করল।

খ্যাতনামা গায়িকা লতা মঙ্গেশকর খুই ফেব্রুয়ারী, ২০২২-এ মুম্বাইয়ে বিচক্যান্ডি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্঵াস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। মুম্বাইয়ে শিবাজী পার্কে পূর্ণ মর্যাদায় তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। পণ্ডিত দীননাথ মঙ্গেশকর ও শিবস্তী

মঙ্গেশকরের কন্যা লতা সঙ্গীতজ্ঞ পরিবারের কন্যা ছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন বিখ্যাত মারাঠি সঙ্গীতজ্ঞ এবং নাট্য শিল্পী। তিনি তাঁর পিতার কাছেই প্রথম শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং শিশু শিল্পী হিসেবে বহু নাটকে অংশগ্রহণ করেন।

বিনয়ী কুমারী মঙ্গেশকর ভারতীয় সর্বোচ্চ জাতীয় পুরস্কার ‘পদ্মভূষণ’ প্রাপ্ত করেন। এছাড়াও বহু ‘ফিল্মফেয়ার’ পুরস্কার (যা অস্কার তুল্য দেশীয় সম্মান) পান যার পর তিনি নিজেকে আরও পুরস্কার গ্রহণ করতে অক্ষম বলে ঘোষণা করেন। টাইম ম্যাগাজিন তাকে “অবিসংবাদিত এবং ভারতের নেপথ্য গায়িকা সম্মানী” আখ্যা দেয়।

১৯৭৬ সালে ৩০শে জানুয়ারী লস অ্যাঞ্জেলেসে যখন তিনি আইন প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে গাইতে ওঠেন লতা মঙ্গেশকর তখন দর্শকদের বলেন, “আমি সঙ্গীতানুষ্ঠানটি আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের সাহায্য কল্পে সম্পাদন করছি। এর মাধ্যমে অর্জিত অর্থ দ্বারা তাদের মুস্তাইয়ে নির্মায়মান সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাগৃহটি সম্পূর্ণ করা হবে।” তারপর তিনি তাঁর অনুরাগীদের তিন ঘণ্টার সঙ্গীত অনুষ্ঠানে নিমগ্ন করে রাখেন। যেখানে প্রথম সংগীতটি ভগবদ্গীতা দিয়ে শুরু হয় যা পরবর্তীকালে তাকে বিশ্বজোড়া খ্যাতি প্রদান করে।

তিনি সংগীতানুষ্ঠানের পর বলেন, “আমি পাঁচ বছর বয়সে গান গাইতে শুরু করি। আমার বাবা আমাকে বেদ থেকে শাস্ত্রীয় সংগীত রাগ ইত্যাদির শিক্ষা দান করেন। শিশুকালে আমি শিখেছিলাম শুধু ভগবানের জন্য গাইতে এবং কেন এই সংগীতানুষ্ঠান? আমার পূর্ণ পরিবার হরেকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের সদস্য..... যখন আমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্য গান করি তখন সমস্ত কিছুই পূর্ণ হয়ে যায়।”

শ্রীল প্রভুপাদ দক্ষিণ কোরিয়াতে আগমন করলেন



পতঞ্জলী মুনি দাস ভক্তিবেদান্ত ম্যানোরের রঞ্জনশালার প্রধান। এছাড়াও তিনি ইসকন দক্ষিণ কোরিয়ার প্রচার কার্য ও দেখাশোনা করেন। সম্প্রতিকালে তিনি শ্রীক্রী রাধাকৃষ্ণন্দ্র

মন্দিরে শ্রীল প্রভুপাদের এক পূর্ণ অবয়ব শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করেছেন। মন্দিরটি দক্ষিণ কোরিয়ার সীমানার নিকটবর্তী মিলিটারীবিহীন অঞ্চলে অবস্থিত যা উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার বিভাজন স্থল।

শ্রীল প্রভুপাদকে কীর্তন, যজ্ঞ, অভিযোক আদি পূর্ণ বৈদিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সুস্থাগতম করা হয়। এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানটিতে সেই দেশের বহু মান্যগন্য ব্যক্তিগণ, অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষ এবং ভক্ত সম্প্রদায় সকলেই অংশগ্রহণ করেছিলেন।

পতঞ্জলীমুনি দাস বলেন, “এই অনুষ্ঠানটি ইসকন দক্ষিণ কোরিয়াতে প্রচারের জন্য এক বৃহৎ পদক্ষেপ।” শ্রীল প্রভুপাদ এখন পূর্ণরূপে তাদের প্রচেষ্টা এবং কোরিয়ান মানুষদের মধ্যে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের সাফল্যের কৃপা প্রদান করছেন।

ভারতীয় ট্রাইবাল কেয়ার ট্রাস্টের ভার্ম্যমান চিকিৎসা বিভাগ



ইন্ডিয়া ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রিলিফ ফান্ড (IDRF) একটি যুক্তরাষ্ট্র কেন্দ্রীয় অলাভজনক সংস্থা। তাদের লক্ষ্য হলো ভারত, নেপাল এবং শ্রীলঙ্কার দরিদ্র পীড়িত মানুষদের সাহায্য করা। তাদের মূল বিষয়টি হলো দরিদ্র মানুষদেরকে শিক্ষা এবং দক্ষতা বিকাশ দান করে তাদের একটি সমৃদ্ধ জীবনযাত্রা দান করা। তারা ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে এই সেবা প্রদান করে চলেছে। জানুয়ারী ২০২২ সালে IDRF ভারতীয় ট্রাইবাল কেয়ার ট্রাস্টকে ইসকনের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করে এবং একটি ভার্ম্যমান চিকিৎসাবাহন অনুদান দেয়। ভারতীয় ট্রাইবাল কেয়ার ট্রাস্ট হল একটি সংস্থা যারা উপজাতি সম্প্রদায়কে সমৃদ্ধিশালী, শিক্ষিত, স্বাস্থ্যবান ও সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধ জীবনধারা দানের জন্য নিঃস্বার্থ সেবা করে চলেছে। তাদের উদ্দেশ্য হল উপজাতির এই শিক্ষাকে বজায় রাখতে সাহায্য করা যারা আজ বিপন্ন। তারা শিশুদের শিক্ষাদান করছে, স্বাস্থ্য পরিষেবার বিকাশ করছে এবং

পারমার্থিক শিক্ষা দ্বারা তাদের জীবনধারাকে সমৃদ্ধ করছে। ভারতীয় ট্রাইবাল কেয়ার ট্রাস্ট দক্ষিণ এশিয়ার অবহেলিত সম্প্রদায়গুলিকেও সময় এবং সামর্থ দ্বারা সাহায্য করছে। তারা সরল জীবন এবং সমৃদ্ধি বিস্তার নীতিটি খুব সফলভাবে কৃতি কাজের মাধ্যমে প্রয়োগ করতে পেরেছে।

ভক্তি পুরুষোত্তম স্বামী (ভারতীয় ট্রাইবাল কেয়ার ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা) IDRF - এর কর্মকাণ্ডকে নিজের ভাষায় প্রশংসা করে বলেছেন, “বিগত পাঁচ ছয় বছর যাবৎ আমরা উপজাতি মানুষদের সেবা করছি। উপজাতির মানুষেরা খুব অবহেলিত, এইট্রাস্ট বিশেষ করে পাঁচটি বিষয়ের ওপর বিশেষ যত্ন নিয়েছে যথা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সমাজ, সম্পর্ক এবং পারমার্থিক বিষয়। সুতরাং এটি একটি বাস এবং আমরা আমেরিকা থেকে অনুদান পেয়েছি। আমেরিকা থেকে IDRF ভারতীয় ট্রাইবাল কেয়ার ট্রাস্টকে এটি দিয়েছে বাস্তবায়ন করার জন্য। সুতরাং আমরা আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের কাছে কৃতজ্ঞ।”

এই বাসটিকে ভ্রাম্যমান চিকিৎসা বিভাগ রূপে ব্যবহার করা হচ্ছে যেখানে ডাক্তার, নার্স এবং ঔষধ সবকিছুই সুলভ হবে। এই বাসে ইসিজি মেশিন এবং অক্সিজেনও সুলভ। আপদকালীন অবস্থায় এটিকে অ্যাম্বুলেন্স হিসাবেও ব্যবহার করা যাবে যাতে মানুষদেরকে সত্ত্বর হাসপাতালে নিয়ে আসা যায় এবং পথেও চিকিৎসা প্রদান করা যায়।

তারা ২৪শে জানুয়ারী থেকে এই বাস সহযোগে নিশ্চল্ল চিকিৎসা পরিষেবা পশ্চিমবঙ্গের ঝাড়গ্রামের উপজাতি সম্প্রদায়ের লোকদের প্রদান করতে শুরু করেছে।

১নং উল্টোডাঙ্গা রোডের মহাআড়ম্বর উৎসবের মাধ্যমে উদ্ঘাটন



২০২২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী ঐতিহাসিক ভক্তিবিনোদ আসন উদ্বোধন উৎসব ১নং উল্টোডাঙ্গা রোডে মহাআড়ম্বরের সঙ্গে পালিত হলো, যেটি ছিল কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদের শুভ আবির্ভাব তিথি। ঠিক একশত

বৎসর পূর্বে আজকের দিনটিতে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল প্রভুপাদের হাদয়ে ইসকনের বীজ বপন করেছিলেন।

১নং উল্টোডাঙ্গা রোডের এই পুরাতন গৃহটি সেই গৃহ যেখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহারাজ তাঁর প্রচার আন্দোলন শুরু করেছিলেন এবং ১৪ বছর বসবাস করেছিলেন (১৯১৮-১৯৩২) যেটি তার ১৮ বছর প্রচার যজ্ঞের সিংহভাগ সময়।

এটি সেই ঐতিহাসিক স্থান যেখানে কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি এ.সি ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রথমবার ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন এবং পাশ্চাত্যে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের অনুপ্রেরণামূলক নির্দেশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

১৯১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর উন্নত কোলকাতার ১নং উল্টোডাঙ্গা রোডে তার প্রথম প্রচার কেন্দ্র ভক্তিবিনোদ আসন-এর উদ্বোধন করেন। তিনি শ্রীমায়াপুর ধাম থেকে আগমনের অন্তিবিলম্বে এর পুনর্নাম করন করেন, ‘গোড়ীয় মঠ’। ১৯২২ সালে যুবক অভয়চরণ দে ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। সেই প্রথম সাক্ষাৎকারেই শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর সেই যুবককে উৎসাহিত করে বলেন— সে একজন শিক্ষিত যুবক, তার উচিত পাশ্চাত্যে ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা ইংরাজীতে প্রচার করা।

শ্রীল প্রভুপাদের কৃপার ফলে ইসকন সেই সম্পত্তি অধিগ্রহণ করার পর ভগ্নপ্রায় ও ধ্বংসূপ্ত সদৃশ গৃহটির পূর্ণ সংক্ষার হয়েছে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের ১৪৮তম পূজাতে বিনীত নিবেদন রূপে ইসকন কলকাতা পুণ্ডিবিস রূপী উৎসবের মাধ্যমে এই পুনর্নির্মিত ভবনটির উদ্বোধন করে।

বহুবিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, শ্রীল প্রভুপাদ শিষ্য সমূহ এবং প্রবীণ বৈষ্ণবগণ এই অনুষ্ঠানটিকে গৌরবান্বিত করেন। যার মধ্যে শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় ভাগবত স্বামী, পথঝরত প্রভু, সংকর্ষণ প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমদ্বারাধানাথ স্বামী, শ্রীমদ্লোকনাথ স্বামী, শ্রীমদ্ভক্তিবিবুধ বোধ্যন মহারাজ, আম্বরীশ প্রভু সন্ধ্যাকালীন অনুষ্ঠানে জুমের মাধ্যমে তাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

মাননীয়া মন্ত্রী ড. শশী পাঁজা (মহিলা ও শিশু বিকাশ এবং সামাজিক উন্নয়ন দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার) এই শুভ অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন। এটি ইসকন কলকাতার এক ঐতিহাসিক এবং মহান সাফল্য যা অনঙ্গমোহন প্রভু এবং রাধারমণ প্রভু ও তাদের নিবেদিত প্রাণ দল সদস্যদের অক্লান্ত এবং নিঙ্কাম সেবার ফল।

ইউক্রেনে ভক্তরা ভয় এবং অস্থিরতা সত্ত্বেও সেবা করে চলেছে



ইউক্রেনে হাজার হাজার কৃষ্ণভক্ত বসবাস করেন এবং সেখানে এরকম কুড়িটি সম্প্রদায় রয়েছে। এছাড়াও ইউক্রেনের রাজধানী কিভে রয়েছে ইসকনের বৃহত্ম মন্দিরটি, অন্যান্য শহর এবং শহরতলীতেও মন্দির বর্তমান। বর্তমানে সেখানে যুদ্ধের জন্য ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হলেও সেখানে ইসকন ভক্তদের এখনো পর্যন্ত আহত হওয়ার কোন সংবাদ নেই।

কিভে ভক্তরা বহুতল বিশিষ্ট মন্দিরটির ভূমিতলের জানলার নিকট রয়েছে। মন্দিরটির দুটি তল ভূমিতলের নীচে অবস্থিত যেটিকে বাঙ্কার হিসাবে ব্যবহার করা যায়, যদি প্রয়োজন পড়ে। মন্দির সংলগ্ন ক্ষেত্রে মিসাইল পতনের খবর আছে। বহুভক্তের পরিবার পরিজন যারা কিভ মন্দিরের নিকটবর্তী অঞ্চলে বাস করেন তারা মন্দিরে পুনর্বাসন নিয়েছে যা যেকোন ব্যক্তিগত অ্যাপার্টমেন্ট অপেক্ষা সুরক্ষিত। ভক্তরা ভয় পেলেই প্রার্থনা, কীর্তন এবং বৈষ্ণব সঙ্গের আশ্রয় নিচ্ছেন। কিভ মন্দিরে যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য মজুত আছে এবং এখন চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই।

সমগ্র পৃথিবীর ভক্তরা জিজ্ঞাসা করছেন কিভাবে সাহায্য করতে পারে। মায়াপুর যা হলো ইসকনের প্রধান দপ্তর সেখানে প্রতিদিন বিশেষ পূজা শুরু হয়েছে ভগবান নৃসিংহদেবের কাছে এবং প্রার্থনা করা হচ্ছে যাতে তিনি ইউক্রেনে ভক্তদের রক্ষা করেন। বিশেষ অন্যান্য প্রান্তের ভক্তরা যেমন ভারতবর্ষ, যুক্তরাষ্ট্র, হাস্পেরী, যুক্তরাজ্য ইত্যাদি কীর্তন সংগঠিত করছেন তাতে তারা ইউক্রেন ভক্ত ও সাধারণ মানুষের সুরক্ষার জন্য প্রার্থনা করছেন এবং শান্তি কামনা করছেন।

এটি ধারণা করা খুব কঠিন যে এই পরিস্থিতিতে শরণার্থী

সমস্যা হবে কি না। তবে ইসকনের যুক্তরাজ্য নেতৃবৃন্দ তৈরী হয়ে আছেন যে হরেক্ষণ ফুড রিলিফের মাধ্যমে কিভাবে সর্বোত্তম সেবা করা যায়। তারা এও বিবেচনা করছেন যে যদি ইউক্রেন ভক্তরা দেশ ছাড়েন তাহলে তাদের কিভাবে সাহায্য করবেন।

রামানুজাচার্য : সাম্যের প্রতিমূর্তি



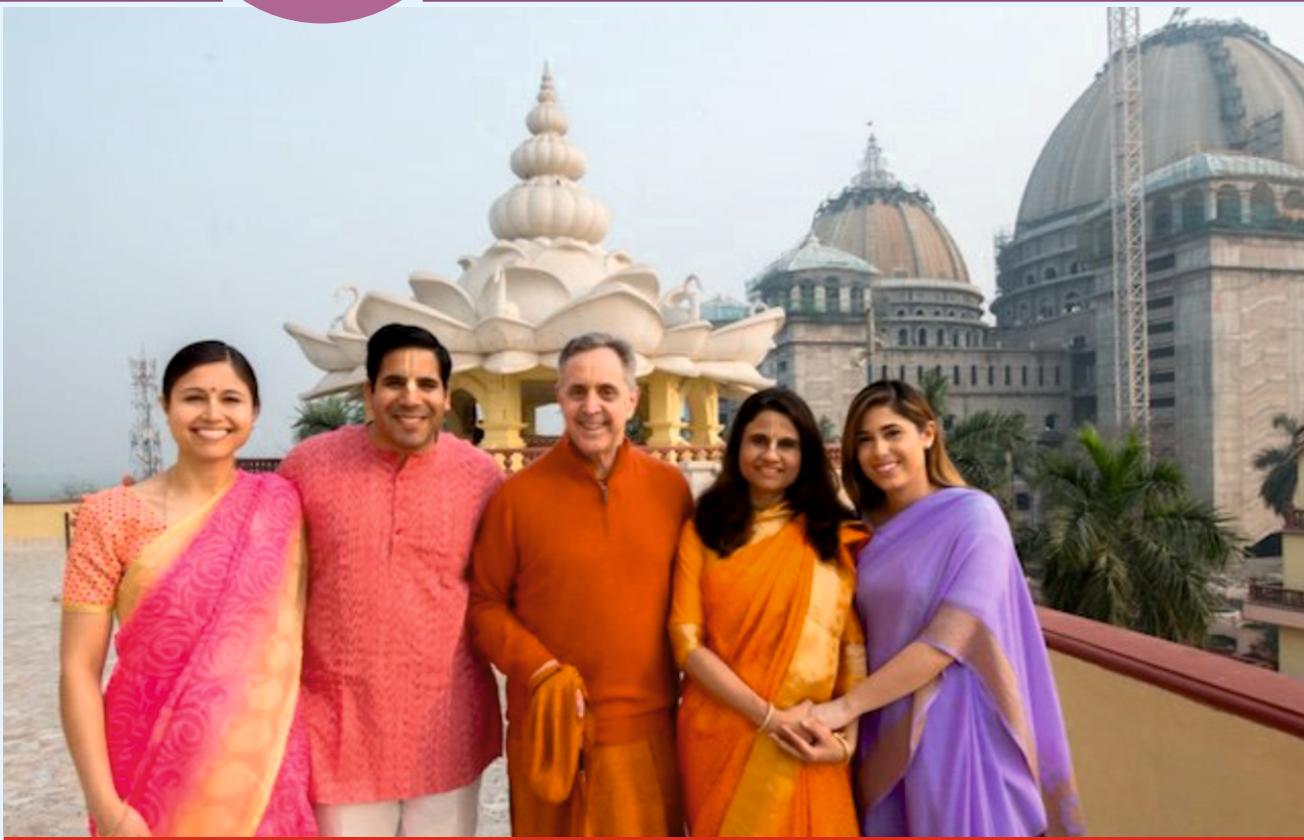
হেই ফেব্রুয়ারী ২০২২, ভারতের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় শ্রী নরেন্দ্র মোদী শ্রীরামানুজাচার্যের হাজারতম জন্মবার্ষিকীর অংশ অনুষ্ঠান হিসেবে রামানুজাচার্য - সাম্যের প্রতিমূর্তি উদ্বোধন করলেন।

এই প্রতিকৃতি ২১৬ ফুট উঁচু যা ধাতব উপবেশনরত সমগ্র পৃথিবীতে সর্বোচ্চ প্রতিকৃতি। হায়দ্রাবাদের উপকর্ত্তে প্রায় ৪৫ একর জমির উপর এই ক্ষেত্রটি অবস্থিত। ২০১৪ সালে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন হয়েছিল। প্রকল্প খরচ ১ হাজার কোটি টাকা যা সমগ্র পৃথিবীব্যাপী ভক্তরা অনুদান দিয়েছিলেন।

এই প্রতিকৃতি পঞ্চাশতু দ্বারা প্রস্তুত। সোনা, রূপা, দস্তা, পিতল এবং তামা সমন্বিত। এটি ভদ্রবেদী নামক ৫৪ ফুট উঁচু এক ভিত্তি নির্মাণের উপর স্থাপিত। নির্মাণটিতে বহুতল বর্তমান যেখানে বৈদিক ডিজিটাল প্রস্থাগার, গবেষণাকেন্দ্র, ভারতীয় প্রাচীনগুরু, একটি প্রেক্ষাগৃহ, রামানুজাচার্যের কর্মসূজ সমন্বিত একটি শিক্ষামূলক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা বর্তমান। ভিত্তিকক্ষে একটি ধ্যানকক্ষ আছে। যেখানে রামানুজাচার্যের ১২০ কেজি ওজনের এক স্বর্ণমূর্তি আছে, যা তার জীবনকালকে বর্ণনা করে।

শ্রীরামানুজাচার্যের আশ্রমের প্রধান শ্রীচিন্মজিয়ার স্বামী এই প্রতিকৃতির রূপরেখা দান করেন। সেখানে ১০৮টি দিব্য দেশম (সুদৃশ্য মন্দির) বর্তমান যা প্রতিকৃতিকে ঘিরে রেখেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধনের পূর্বে এই দিব্য দেশমণ্ডলী পরিদর্শন করেন।



গৃহস্থ জীবনে কেমনভাবে থকা উচিত প্রসর গৌরচন্দ্র দাস

মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য হলো এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবদ্বামে ফিরে যাওয়া। যদি কেউ এই উদ্দেশ্য সফল করতে চান তবে তাঁকে অবশ্যই তাঁর যৌন কামনা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। সমগ্র বৈদিক সভ্যতার মূল পরিকল্পনাই হল এই যৌন বাসনাকে দমন করা। বৈদিক সমাজে সেজন্য চারটি আশ্রম ব্যবস্থার প্রচলন ছিল—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বাণপ্রস্থ, সন্ন্যাস। এই চারটি আশ্রমের মধ্যে ব্রহ্মচর্য, বাণপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস—এই তিনটি আশ্রমেই যৌন জীবন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কেবলমাত্র গৃহস্থ আশ্রমেই পরিমিত পরিমাণে (শুধুমাত্র কৃষ্ণভক্ত সুসন্তান উৎপাদনের জন্য) যৌন জীবনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে—ভোগের জন্য নয়।

এই মনুষ্য শরীর এবং তার মধ্যেও গৃহস্থ আশ্রম জীবের উদ্ধার প্রাপ্তির পাঠশালা। ভোগ বিলাস বা আরাম করার জন্য এই মনুষ্য শরীর নয়। শাস্ত্র বিহিত সকাম যজ্ঞাদি কর্মের দ্বারা স্বর্গলোক-ব্রহ্মলোক আদি লাভ করার জন্যও নয়। কারণ ওখানে গিয়েও ভোগক্ষয় হয়ে গেলে আবার এখানেই ফিরে আসতে হবে — “আব্রহাম্বুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোহর্জুন”

(গীতা ৮।১৫), “তে তৎ ভুক্ত স্বর্গলোকং বিশালং, ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।” (গীতা ৯।১১)। কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলন দ্বারাই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন—“কৃষ্ণভাবনামৃতের অনুশীলন হচ্ছে মায়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার মতো। যৌনবাসনা হল মায়ার সবচেয়ে শক্তিশালী বন্ধন। গৃহস্থজীবন হল দুর্গের আশ্রয়ে সুরক্ষিত থেকে মায়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। কোন ব্রহ্মচারী যদি অনুভব করে যে উপস্থিতে ধারণ করতে সে একেবারেই অক্ষম হয়ে পড়ে, তখন তাকে অবশ্যই গৃহস্থ আশ্রম বরণ করতে হবে। যে সৈনিক সম্মুখ যুদ্ধে প্রার্জিত, তাকে অবশ্যই (পত্নীরূপ) দুর্গের আশ্রয় প্রহণ করে যুদ্ধ করতে হবে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই যুদ্ধক্ষেত্র (কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলন) থেকে পালিয়ে শক্তির (মায়ার) কাছে বশ্যতা স্থাকার করা চলবে না।”

কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলন কোন জাগতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল নায়। গার্হস্থ, বাণপ্রস্থ কিংবা সন্ন্যাস ইত্যাদি আশ্রমগত পার্থক্যের উপরেও ভক্তির বিকাশ নির্ভর করে না।

যে রকম পরিস্থিতি এবং যে আশ্রমে থাকুন না কেন সেটাকেই শ্রীকৃষ্ণের কৃপা বলে মনে করে সকল পরিস্থিতিতেই যথাসন্তুষ্ট কৃষ্ণসেবার সুযোগ নিতে হবে এবং গুরুদেবের ব্রতকে বাস্তবায়িত করতে হবে। স্বধর্ম পালন অবশ্যই করতে হবে। চারটি আশ্রমের কোনও একটা আশ্রমকে গ্রহণ করার পর তা ইচ্ছামতো পরিবর্তন বা ত্যাগ করা আমাদের উচিত নয়—এটা সবচেয়ে বড় ভুল। ভক্তি এসবের উপর নির্ভরশীল নয়। অর্জুনকে ক্ষাত্রধর্ম, গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করে ভক্ত হতে হয়নি। গৃহস্থও তাঁর স্বধর্মে স্থির থেকেই শুন্দি ভক্ত হতে পারেন। এই ব্যাপারে এক মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন ইসকন প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীল অভয়চরণারবিন্দি ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ স্বয়ং। সারা জীবন গাহস্ত্র্য জীবন যাপন করে ভোগ উপভোগ করা মানবজীবনের উদ্দেশ্য নয়। শাস্ত্রে নিবৃত্তিকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। এজনই গাহস্ত্রের পর বানপন্থ এবং তারপর সন্ধ্যাস আশ্রম পালনের বিধান দেওয়া হয়েছে। কলিযুগে সন্ধ্যাসধর্ম যথাযথ পালনের পক্ষে অনেক রকম বাধা বিঘ্ন আছে। সেজন্য সরকারী কর্মচারী যেমন চাকরী থেকে অবসর নেয়, ঠিক তেমনই মানুষেরও সংসার জীবন থেকে অবসর নেওয়া উচিত। সাংসারিক কাজ কর্মের দায়িত্ব সন্তান-সন্তির উপর ছেড়ে দিয়ে ঘরে থেকেও পূর্ণরূপে ভগবৎসেবায় নিজেকে নিয়োজিত করা উচিত।

এখন দেখতে হবে গৃহস্থ জীবনে আমাদের কিরণপ আচরণ করা উচিত কিভাবে আমাদের দায়িত্ব কর্তব্য পালন করা উচিত, যার ফলে গৃহস্থজীবন গৃহস্থ আশ্রমে পরিণত হয়। এ ব্যাপারে কে আমাদের আদর্শ হতে পারেন? “বৈষ্ণবানাং যথা শন্তু”—শন্তু অর্থাৎ দেবাদিদেব মহাদেব হলেন বৈষ্ণবদের মধ্যে অগ্রগণ্য, তাঁর স্ত্রী দেবী পার্বতীও একজন পরম বৈষ্ণবী। সুতরাং তাঁরা কিভাবে গাহস্ত্র্য জীবন পালন করছেন এবং এ ব্যাপারে জগদ্গুরু দেবাদিদেব মহাদেবের উপদেশগুলি আমরা অনুসরণ করতে পারি।

দেবাদিদেব মহাদেব মুগ্ধমালা এবং সর্প ধারণ করে থাকেন, মাতা পার্বতী সুন্দর অলংকার পরিধান করে থাকেন, কার্তিকের ছটা মুখ এবং গণেশের লম্বা শুঁড় ও ভুঁড়ি। এদের নিজ নিজ বাহন বৃষ, সিংহ, ময়ূর এবং ইঁদুর—এদের পরম্পরের মধ্যে খাদ্য-খাদক সম্পর্ক। এই পরম্পর বিরোধ সম্পর্ক সন্ত্বেও দেবাদিদেব মহাদেবের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সদস্যবন্দি প্রেমপূর্ণ গ্রন্থ বর্তমান। এরকমই গৃহস্থের সংসারে বিভিন্ন স্বভাবের সদস্যদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে

থাকতে গেলে নিজের নিজের অভিমান ও স্বার্থ ত্যাগ করে অপরের হিত এবং সুখের দিকে নজর রেখে চলতে হবে।

মহানির্বাণ তত্ত্বে দেবাদিদেব মহাদেব জগন্মাতা পার্বতীকে গৃহস্থ ধর্ম সম্পর্কে বলেছেন—

ঋক্ষানিষ্ঠাহস্তঃ স্যাংব্রহজ্ঞানপরায়ণঃ।

যদ্যৎ কর্মপ্রকুর্বীত তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ। । ৮। ২৩।।

—“গৃহস্থ ব্যক্তি ভগবৎপরায়ণ হবে। ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভই তাঁর জীবনের চরম উদ্দেশ্য হবে। তা সন্ত্বেও তাঁকে সর্বদা কর্ম করতে হবে। তাঁর নিজের সমস্ত কর্তব্যসাধন করতে হবে এবং তিনি যা-ই করবেন তা-ই তাঁকে ভগবানে সমর্পণ করতে হবে।”

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় (৯। ১৭) অর্জুনকে একই উপদেশ প্রদান করেছেন—“হে কৌন্তেয়! তুমি যা অনুষ্ঠান কর, যা আহার কর, যা হোম কর, যা দান কর এবং যে তপস্যা কর,

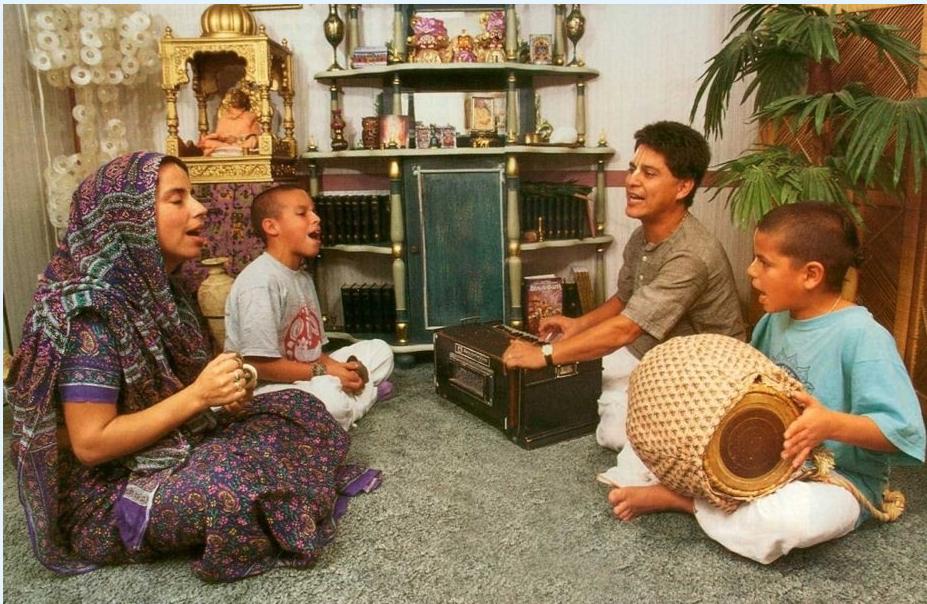
এই জগতের কোনও প্রতিকূলতাই কৃষ্ণভক্তিকে তথা কৃষ্ণভক্তকে প্রতিহত করতে পারে না। তবে কৃষ্ণভক্তির দোহাই দিয়ে পারিবারিক দায়িত্বকে অস্বীকার করাও গৃহস্থের পক্ষে অন্যায়। একজন উন্নত কৃষ্ণভক্ত গৃহস্থ তাঁর পারিবারিক দায়িত্ব পালন করেও অপ্রতিহত গতিতে কৃষ্ণভাবনাময় স্বাধীনতা আস্বাদন করতে পারেন। তিনি গৃহে থাকলেও গৃহের কল্যাণে কল্যাণিত হন না। জলে থাকলেও পদ্মপাতায় যেমন জল লাগে না, তেমনি গৃহে থাকলেও তার চেতনা গৃহ-আসক্তি থেকে মুক্ত থাকে।

সেই সমস্তই আমাকে সমর্পণ কর।”

কর্ম করা অথচ ফলভোগের আকাঙ্ক্ষা না করা, লোককে সাহায্য করা অথচ তার কাছ থেকে কোনপ্রকার কৃতজ্ঞতা প্রত্যাশা না করা, সৎকর্ম করা অথচ তাতে নামযশ হলো বা না হলো, এ বিষয়ে একেবারে দৃষ্টি না দেওয়া—এটাই এ জগতে সব থেকে কঠিন কাজ। সহস্র লোকের প্রশংসার সামনে ঘোরতর কাপুরুষও বীর হয়ে যায়, কিন্তু কারো স্তুতি-প্রশংসা না চেয়ে অথবা সেদিকে আদৌ দৃষ্টি না দিয়ে অপরের হিতসাধন করে চলাই প্রকৃতপক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ স্বার্থত্যাগ।

জীবিকা অর্জনঃ

গৃহস্থকে প্রথমত ভগবৎতত্ত্বজ্ঞান, দ্঵িতীয়ত ধন উপার্জনের জন্য চেষ্টা করতে হবে। গৃহস্থ সমগ্র সমাজের মূল ভিত্তি ও অবলম্বন। তাঁর উপর শত শত ব্যক্তি নির্ভর করছে। যদি সে যথেষ্ট ধন উপার্জন করে তবে শত শত ব্যক্তির ভরণপোষণ হবে। এ ব্যাপারে মহানির্বাণ তত্ত্বে দেবাদিদেব মহাদেব বলছেন—



ন মিথ্যাভাষণং কুর্যাত্ ন চ শাস্ত্যং সমাচরেৎ।

দেবতাতিথি পূজাসু গৃহস্থে নিরতো ভবেৎ।।(৮।১৪)

—‘অর্থাৎ গৃহস্থের প্রধান কর্তব্য জীবিকা অর্জন, কিন্তু তাকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে, মিথ্যা কথা বলে, প্রতারণা দ্বারা অথবা চুরি করে যেন জীবিকা অর্জন না করেন। আর তাকে সবসময় স্মরণ রাখতে হবে, তার জীবন ভগবৎ সেবার জন্য, দরিদ্র অভাবগ্রস্তদের সেবার জন্য।’

সৎভাবে অর্থ উপার্জন এবং সৎকাজে অর্থব্যয় করা গৃহস্থের পক্ষে উপাসনা। সন্ধ্যাসী নিজ কুটিরে বসে উপাসনা করলে তা যেমন তাঁর মুক্তির সহায়ক হয়, গৃহস্থেরও ঠিক তাই হয়ে থাকে; যেহেতু উভয়ের মধ্যেই ঈশ্বর ও তাঁর সবকিছুর উপর ভক্তিভাবপূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং ত্যাগরূপ ধর্মভাবের বিকাশ পরিলক্ষ্যত হয়।

সদাচারঃ “গৃহী ব্যক্তি অতিরিক্ত নিদ্রা, আলস্য, দেহের যত্ন, কেশবিল্যস এবং অশন-বসনে আসক্তি ত্যাগ করবে। গৃহী ব্যক্তি আহার-নিদ্রা-বাক্য-মৈথুন এসকলই পরিমিতভাবে করবে। গৃহস্থ অকপট, নষ্ট, বাহিরে-অস্তরে শুচি সম্পন্ন এবং সমস্ত কর্মে উদ্যোগী ও নিপুণ হবে।” (মহানির্বাগ তত্ত্ব ৮।৫১,৫২)।

“গৃহস্থ নিজ যশ ও গৌরবের বিষয়, অপর কর্তৃক কথিত গোপন কথা এবং অপরের উপকারের জন্য তিনি যা করেছেন—এই তিনটি বিষয়ে কখনো সাধারণের কাছে প্রকাশ করবেননা।” (মহানির্বাগ তত্ত্ব ৮।৫৬)

“আতা ও পিতাকে প্রত্যক্ষ দেবতাঙ্গানে গৃহী ব্যক্তি সর্বদা যত্নের সহিত তাঁদের সেবা করবেন। যদি মাতা-পিতা তুষ্ট

থাকেন, তবে সেই ব্যক্তির প্রতি ভগবান প্রীত হন। হে পাৰ্বতী! তুমিও তাঁর প্রতি প্রীতাহও।”

(মহানির্বাগতত্ত্ব ৮।২৫-২৬)।

“নিজ পত্নী বর্তমানে অন্যের পত্নীকে স্ত্রী ভাবে স্পর্শ করবে না, পরস্তীর সঙ্গে নির্জনে সাক্ষাৎ, কিংবা বাস করবে না, কোনও স্ত্রীলোকের সম্মুখে অশিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করবে না এবং নিজের বাহাদুরিও দেখাবে না।” (ম.নি.তত্ত্ব-৮।৩৯-৪২)।

“চার বৎসর বয়স পর্যন্ত পুত্রগণকে লালন পালন করবেন; ঘোড়শ বর্ষ পর্যন্ত নানাবিধি সদ্গুণ ও বিদ্যা শিক্ষা দেবেন। বিংশতি বর্ষে

অধিক বয়সে তাদের গৃহকর্মে প্রেরণ করবে। এরূপে কন্যাকেও পালন করতে হবে, অতি যত্নপূর্বক শিক্ষা দিতে হবে এবং ধনরত্নের সঙ্গে উপযুক্ত পাত্রের হাতে সম্প্রদান করতে হবে।” (ম.নি.তত্ত্ব ৮।৪৫)।

স্বামী-স্ত্রীর পারম্পরিক আচরণঃ নারী হলেন শক্তি। পুরুষ হলেন শক্তিমান। শক্তিকে সবসময় শক্তিমানের তত্ত্বাবধানে থাকা প্রয়োজন, না হলে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। মনুসংহিতা অনুযায়ী নারী কখনো স্বতন্ত্র নয়। বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত সে পিতার সম্পত্তি, বিবাহের পর স্বামীর সম্পত্তি এবং স্বামীর অবর্তমানে তিনি তার পুত্রদের সম্পত্তিরূপে অবস্থান করেন। নারী সর্বদাই পিতা, পতি অথবা উপযুক্ত পুত্রের উপর নির্ভরশীল থাকেন।

স্বামীর দায়িত্ব - কর্তব্যঃ —‘স্ত্রীর প্রতিপালন ও রক্ষণের দায়িত্ব স্বামীর। স্ত্রীর ন্যায্য চাহিদা পূরণ করার দায়িত্ব স্বামীর। গৃহীব্যক্তি পত্নীকে কখনো কষ্ট দেবেন না, তাঁকে সর্বদা যথাযথভাবে পালন করবে। আর যদি তিনি সাধ্বী ও পতিরূপ হন, তবে ঘোর কষ্টেও তাঁকে ত্যাগ করবে না। ধন, বস্ত্র, প্রেম, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও সুমধুর বাক্য দ্বারা পত্নীর সন্তুষ্ট বিধান করবেন। স্ত্রীকে কটুকথা বলা, চিংকার করে কথা বলা, তিরক্ষার করা বা প্রহার করা নিন্দনীয় অপরাধ।’ (ম.নি.তত্ত্ব ৮।৩৯-৪২)।

পুরুষের ধর্ম-অর্থ-কামে প্রধানতঃ স্ত্রী-ই সাহায্যকারিনী হয়। পুরুষের সর্বোত্তম সম্পদ হল তার স্ত্রী। পুরুষের স্ত্রীর মতো কোন বন্ধু নেই এবং ধর্ম সাধনেও স্ত্রীর মতো সাহায্যকারী কেউ নেই। যার গৃহে সাধ্বী এবং মধুরভাষিনী স্ত্রী

নেই, তার কাছে ঘরও যা বনও তাই।

স্বামীর প্রধান দায়িত্ব স্তুকে ভক্তিপথে যুক্ত করা। অমলপুরাণ শ্রীমদ্বাগবতে নির্দেশ করা হয়েছে যে, “ভক্তিপথের উপদেশ দ্বারা যে ব্যক্তি তার পত্নীকে মৃত্যুরূপ সংসার চক্র থেকে মুক্ত করতে পারবেন না, সেই ব্যক্তির বিবাহ করা উচিত নয়, সে কারো পতি হওয়ার উপযুক্ত নয়।”

স্তুর যোগ্যতা এবং দায়িত্ব-কর্তব্যঃ স্তুর প্রথম যোগ্যতা হল—তিনি স্বামীর কাছে কখনোই এমন কিছু চাইবেন না, যা সংগ্রহ করতে স্বামীকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হবে বা অন্যায় পথ অবলম্বন করতে হবে।

স্তুর ইষ্টদেব হলো পতি। নারী তার পিতা-ভাতা-পুত্রের কাছে সামান্যই সাহায্য পায়, স্বামীই তাকে সুখ প্রদান করে। স্তুর কাছে পতির মতো আর কেউ নেই, তার কাছে ধন ও সর্বস্বের থেকে পতিই পরম গতি।

স্তু হলো স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী, একে অপরের পরিপূরক। একে অপরের দোষ বার করে তাই নিয়ে খোঁটা দেওয়া উচিত নয়, বরং একে অপরের দোষ নিজ গুণ দিয়ে ঢেকে দেবে। স্বামী-স্তুর পারম্পরিক কথাবার্তা, সাংসারিক আচার-আচরণ কখনোই ত্রুটীয় পক্ষের কানে যেন নায়া।

স্তু হলেন সহধর্মিনী, তিনি স্বামীর ধর্মের সহায়। অতএব স্বামীর সেবা, সুখসাধন এবং ধর্মের সহায়তা—এটাই স্তুর ধর্ম। পতি অথবা পরমেশ্বর ভগবানকে সেবা করার দুটি পদ্ধা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—বিশ্বাসেন (অন্তরঙ্গতা সহকারে) এবং গৌরবেন (গভীর শ্রদ্ধা সহকারে)। পতি হচ্ছেন অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু, তাই পত্নী একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো তার সেবা করবে, আবার সেই সঙ্গে তার পতিকে ‘গুরু’ রূপে জেনে তার প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ হতে হবে। স্বাভাবিক প্রবণতা অনুসারে পতি তার পত্নীর থেকে নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে এবং তা পালন করা অবশ্য কর্তব্য। পতি যদি কোন ভুলও করে, পত্নীকে তা সহ করতে হবে

(মন্দোদরী, দময়স্তী, দ্রোপদী) এবং তা হলোই পতি-পত্নীর মধ্যে কোন ভুল বোঝাবুঝি হবে না। ভুল বোঝাবুঝি হলো পত্নীকে সংযত থাকতে হয়। সর্বদা পতির শুভ কামনা করা এবং মধুর বাক্যে তার সঙ্গে কথা বলা উচিত। বাইরের জগতে জড় বস্ত্র সংস্পর্শে আসার ফলে পুরুষ মানুষ উত্তেজিত হয়ে পড়ে। তাই, গৃহে মধুর বাক্যের

দ্বারা তাকে সন্তানগ করা পত্নীর কর্তব্য। (শ্রীমদ্বাগবত ঢ ।২৩।১২)

পারমার্থিক চেতনায় পত্নী পতির সমকক্ষ বা তার থেকে উন্নত হলো পত্নীর গর্বিত হওয়া উচিত নয়। পত্নীকে পিতৃকুলের গর্বে গর্বিত হওয়া উচিত নয়। তার কর্তব্য হলো সর্বদা পতির অনুগত থাকা এবং সর্বপ্রকার অহঙ্কার ত্যাগ করা। পত্নী যদি তার পিতৃকুলের গর্বে গর্বিতা হয় তাহলে তাদের বৈবাহিক জীবন ছারখার হয়ে যাবে। (শ্রীমদ্বাগবত ঢ ।২৩।১৩)

পত্নীর কর্তব্য হচ্ছে পতির রঞ্চি দেখে, সেই অনুসারে আচরণ করা (গান্ধারী)। পতি যদি মহান ভগবদ্ভক্ত নাও হন, তবুও পত্নীর কর্তব্য হচ্ছে তার মনোভাব অনুসারে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া। তার ফলে বিবাহিত জীবন অত্যন্ত সুখময় হয়। (শ্রীমদ্বাগবত ঢ ।২৩।১৪-৫)।

স্তু হলেন স্বামীর অনুপ্রেরণা, শক্তি, স্বামীর দুর্গ স্বরূপ—যার মধ্যে আশ্রয় নিয়ে স্বামী মায়ারূপী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে বিজয়ী হবে। স্তু ধর্মপথে স্বামীর সহযোগিতা করবে, একে অপরের পূর্ণ সহযোগিতা ছাড়া আধ্যাত্মিক উন্নতি কারো পক্ষেই সন্তুষ্ট হবে না। স্বামী-স্তুর একের অপরের প্রতি শ্রদ্ধা-বিশ্বাস না থাকলে, একে অপরকে ভালবাসতে না পারলে, তারা গুরু-কৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, বিশ্বাসপরায়ণ হতে পারবে না। কৃষ্ণকে ভালবাসা তাদের পক্ষে কোনদিনই সন্তুষ্ট হবে না।

সংযম এবং সহিষ্ণুতা গৃহস্থ জীবনের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান সম্পত্তি। নল-দময়স্তী, হরিশচন্দ্র-শৈব্যা, সাবিত্রী-সত্যবান, দ্রৌপদী-যুধিষ্ঠির এরাই আমাদের অনুসরণীয়। শ্রীরাম-সীতা, শ্রীকৃষ্ণ - রঞ্জিনী - সত্যভামা - এঁদের পারম্পরিক আচরণ থেকে আমাদের শিক্ষালাভ করতে হবে।



এই মনুষ্য জগ্নে আমাদের সবচেয়ে বড় কর্তব্য হলো কৃষকথা শ্রবণ-কীর্তনরূপ নববিধা ভক্তির তীব্র অনুশীলন করা। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই যখন কৃষ্ণভাবনামৃতে উন্নতি লাভ করেন তখন তাঁরাও সন্ধ্যাসীর মতোই স্বাধীনভাবে সমগ্র বিশ্বে কৃষ্ণভাবনামৃতে প্রচার করতে সক্ষম।

তবে, কোনও পরিবারে যদি দেখা যায় যে, সেখানে স্বামী ভক্ত, কিন্তু স্ত্রী বা সন্তানেরা ভক্ত নয়, কিংবা স্ত্রী ভক্ত অথচ স্বামী বা সন্তানেরা ভক্ত নয়, সেক্ষেত্রেও শুন্দ কৃষ্ণভক্তির স্বাধীনতা অঙ্গুলি থাকতে পারে। কেননা, এই জগতের কোনও প্রতিকূলতাই কৃষ্ণভক্তিকে তথা কৃষ্ণভক্তকে প্রতিহত করতে পারে না। তবে কৃষ্ণভক্তির দোহাই দিয়ে পারিবারিক দায়িত্বকে অস্থীকার করাও গৃহস্থের পক্ষে অন্যায়। একজন উন্নত কৃষ্ণভক্ত গৃহস্থ তাঁর পারিবারিক দায়িত্ব পালন করেও অপ্রতিহত গতিতে কৃষ্ণভাবনাময় স্বাধীনতা আস্থাদন করতে পারেন। তিনি গৃহে থাকলেও গৃহের কল্যাণে কল্যাণিত হন না। জলে থাকলেও পদ্মপাতায় যেমন জল লাগে না, তেমনি গৃহে থাকলেও তার চেতনা গৃহ-আসক্তি থেকে মুক্ত থাকে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রমুখ

এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। শ্রীল প্রভু পাদ বলেন (শিক্ষামৃত-পৃঃ৮৭২) — “গৃহস্থদের পক্ষে পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে ওঠার পক্ষে কোনও প্রতিবন্ধকই নেই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অধিকাংশ পার্বদ্বৈ ছিলেন গৃহস্থ এবং এঁদের সকলেই মহাপ্রভুকে তাঁর সংকীর্তন প্রচারে সাহায্য করেছিলেন।”

সিদ্ধান্তঃক গৃহস্থ, কি সন্ধ্যাসী—শ্রীকৃষ্ণের সেবাই তাঁর একমাত্র প্রয়োজন। যিনি নিষ্ঠা সহকারে, নাছোড়বান্দা হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় লেগে থাকবেন, তিনিই পূর্ণরূপে সিদ্ধিলাভ করবেন। শ্রীগুরুদের পূর্ণরূপে প্রসন্ন হলে গৃহস্থও পরমপদ প্রাপ্ত হতে পারেন। “যস্য প্রসাদাঽ ভগবৎ প্রসাদো ...” (শ্রীশ্রীগুরুবর্ষক্রম ৮)। যতদিন আমরা এই জড় জগতে জড় দেহের বন্ধনে আবদ্ধ, শুন্দ ভক্ত না হওয়া পর্যন্ত কর্ম-বেশী কামনা-বাসনা আমাদের মধ্যে জাগ্রত হবেই, এটা খুব একটা অস্বাভাবিক নয়। সেজন্য আমাদের একমাত্র কর্তব্য হলো ভগবানের শুন্দ ভক্ত সদ্গুরুর শ্রীচরণারবিন্দের আশ্রয় প্রাহণ করে তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের চেষ্টা করা।

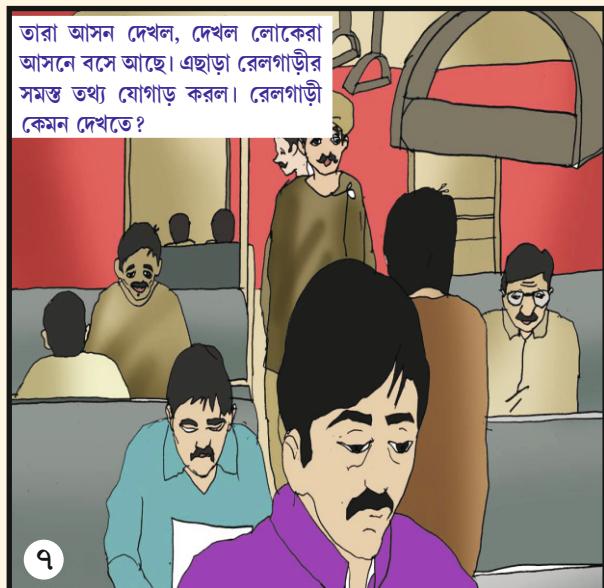


গ্রামবাসী এবং রেলগাড়ী

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি এ.সি ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের শিক্ষামূলক গল্প থেকে সংগৃহীত।

ভারতবর্ষের এই প্রত্যন্ত গ্রামটিতে এই প্রথমবারের জন্য রেলগাড়ী এসেছিল। তাই বহু গ্রামবাসী প্লাটফর্মে একত্রিত হয়েছিল সেই প্রথমবার আগত ট্রেন দেখবার জন্য।





উপদেশ : উপলক্ষ্মির বিভিন্ন স্তর বর্তমান- ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান। বদন্তি তত্ত্ববিদ্যস্তত্ত্বং যা আদ্য জ্ঞান, অর্থাৎ কে এবং অদ্বিতীয় বাস্তব বস্তু, জ্ঞানীগণ তাকেই পরমার্থ বলেন। সেই তত্ত্ববস্তু ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান- এই ত্রিবিধি সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত বা কথিত হন।

ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান গুণগতভাবে অভিন্ন। উপনিষদের অনুগামী জ্ঞানীদের কাছে তা নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে উপলক্ষ হয়, যোগীদের কাছে পরমাত্মা বা হিরণ্যগর্ভরূপে উপলক্ষ হয় এবং ভক্তদের কাছে ভগবান রূপে প্রকাশিত হয়। পক্ষান্তরে বলা যায়, ভগবান অথবা পরম ঈশ্বর হচ্ছেন পরম-তত্ত্বের সর্বোচ্চ উপলক্ষ। পরমাত্মা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের আংশিক প্রকাশ, এবং নির্বিশেষ ব্রহ্ম হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের রশ্মিচ্ছটা, যেমন সূর্য কিরণ হচ্ছে সূর্যদেবের রশ্মিচ্ছটা।

শ্রীকৃষ্ণ দর্শন বাজেলা

ଶ୍ରୀଲ ବିଦ୍ୟମଙ୍ଗଳ ଠାକୁର



ଅମୂଳ୍ୟ ଧନ୍ୟାନି ଦିନାନ୍ତରାନି
ହରେ ସ୍ଵଦାଲୋକନମନ୍ତରେଣ ।
ଆନାଥବନ୍ଦୋ କରନୈକସିଦ୍ଧୋ
ହା ହଞ୍ଚ ହା ହଞ୍ଚ କଥିଂ ନୟାମି ।

কিবা যে এ দিন	কিবা যে রজনী
কিরূপে কাটাই কাল ?	
বহু দুঃখকর	পতিপুত্র ঘর
জীবনের জঙ্গল।	
গৃহকর্মে রাত	ছিল দুটি হাত
সংসার ধরমে মন।	
সেই প্রাণ মন	করেছ হরণ
হারি হে জনার্দন ॥	
অনাথ জনারে	করো অঙ্গীকার
হে দয়াল দীনবন্ধু।	
করিব ভজন	তোমার চরণ
তুমি করণার সিঞ্চু ॥	
মনে করো কিবা	চত্পত্তি আমরা
করি ধর্ম উল্লংঘন।	
জানি হে দয়িত !	প্রতিদিন বৃথা
বিনা তব দরশন ॥	
তোমা ছাড়ি মোরা	কোথায় পড়িব
কেমন জীবন ধরি।	
অনর্থক সব	অসার সংসারে
সাব শুধ তমি হৰি ॥	

ଅଶ୍ରାନ୍ତ ସମ୍ମିତମରଙ୍ଗାରଙ୍ଗାଥରୋଷ୍ଟେ
ହର୍ବାର୍ଦ୍ଦ ଦ୍ଵିଗୁଣ ମନୋଜ୍ଞ ବେଣୁଗୀତମ୍।
ବିଭାଗ୍ୟଦ୍ଵିପୁଲ ବିଲୋଚନାଧମୁକ୍ତ
ବୀକ୍ଷିଯେ ତବ ବ୍ୟାଦନାସ୍ଵର୍ଜଂ କଦମ୍ବ ନ ॥

সব অরুণেরো	অরুণ তোমার
অধরের রূপরাশি ।	
সকল হ্লানি-	ঠাঁধার নাশয়ে
মৃদুল মধুর হাসি ॥	
তাহে মনোরম	বেগুর মুছনা
ব্যাকুল করয়ে মন ।	
পাইব তোমারে	কোন্ জনমেতে
হে শ্রীমধুসুদন ॥	
আধা সে চাহনি	আয়ত নয়ানে
ভারী চঢ়ল চোখে ।	
হৃদয়-আনন্দ	হেরিব কবে সে
ধরিব আমার বুকে ॥	
মনোহর তব	বদন অম্বুজ
সদা দেখিবার লাগি ।	
আকুল হইয়া	দিন গুনিতেছে
এই দীনা অনুরাগী ॥	
সেইদিন কবে	সৌভাগ্য আমার
হবে হে করুণাময় ।	
তব রূপ হেরি	প্রাণ রাখিবার
বাসনা পূরণ হয় ॥	
অনুবাদ : সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী	

